প্র. না. বি

শ্রীগুরু লাইব্রেরী
২০৪, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬

প্রথম প্রকাশ
আশ্বিন, ১৩৬৩

প্রকাশক
শ্রীভুবনমোহন মজুমদার, বি. এস-সি.
শ্রীগুরু লাইব্রেরী
২০৪, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট
কলিকাতা-৬

মুদ্রক
শ্রীশম্ভুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
মানসী প্রেস
৭৩, মাণিকতলা ষ্ট্রীট
কলিকাতা-৬

প্রচ্ছদপট
অখিল গঙ্গোপাধ্যায়

প্রচ্ছদপট মুদ্রক
ভারতমাতা প্রেস
৩০, বেনিয়াটোলা লেন
কলিকাতা-৯

শ্রীবিমলচন্দ্র সিংহ

করকমলে

অবচেতন

এতদিনে সেই অত্যাশ্চর্য কাহিনী প্রকাশ করা যাইতে পারে। কাহিনী বলিতে সাধারণত অবাস্তব ও অলৌকিক কিছু বোঝায়। যে-বিবরণ প্রকাশ করিতে উদ্যত হইয়াছি, তাহা আমার পরিচিত এক ব্যক্তির স্বচক্ষে দৃষ্ট, তবু কাহিনী ছাড়া আর কোন শব্দ তাহার প্রতি প্রযোজ্য নয়। কে বিশ্বাস করিবে, কে না করিবে, সে চিন্তা আর করিব না, ঐ চিন্তা করিয়াই কাহিনীটি এতদিন চাপিয়া রাখিয়াছিলাম। কিন্তু এখন শ-বাবুর মৃত্যু হওয়ায় কাহিনী প্রকাশের মূল প্রতিবন্ধক দূর হইয়াছে।

আমি নিজে শ-বাবুর মুখে গল্পটি বহুবার শুনিয়াছি। তাহার প্রকৃত মর্ম উদ্ধারের আশায় দুইজনে মিলিয়া ঘটনার উপরে যুক্তি ও বিচারের আলোকরশ্মি নিক্ষেপ করিয়াছি, যত রকমে সম্ভব তাঁহার অলৌকিক অভিজ্ঞতাকে বিশ্লেষণ করিয়াছি, ব্যাপারটা অবচেতন মনের লীলা, না অতি প্রাকৃতের খেলা, না কেবলি চোখের মরীচিকা, কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারি নাই। প্রথমবার শুনিয়া যেমন হতবুদ্ধি হইয়া গিয়াছিলাম, আজও তেমনি হতবুদ্ধি আছি। বরঞ্চ সে-ভাবটা যেন আরও বাড়িয়াছে। অসম্ভবের রঙ কালক্রমে ফিকা হইয়া আসে, কিন্তু ইহার রঙ ক্রমে গাঢ়তর হইয়াছে। তাহার উপরে শ-বাবুর মৃত্যুতে এ-বিষয়ে আলোচনা করিবার সঙ্গীরও অভাব হইয়া পড়িয়াছে। অনেক সময়ে একাকী মনে মনে ঘটনাকে ওলটপালট করিয়া দেখি, যথা পূর্বং তথা পরম্, কোন তল পাই না।

অবশেষে এক সময়ে শ-বাবুকে বলিয়াছিলাম, "বিচার-বিশ্লেষণ থাকুক, আমার অবচেতন থিওরি আর আপনার প্রতিপ্রাকৃত থিওরিও থাকুক, এক কাজ করুন, ঘটনার বিবরণ লিখে ফেলুন।"

আমার কথা শুনিয়া শ-বাবু বলিয়া উঠিয়াছিলেন, "কী সর্বনাশ। তাহলে লোকে মনে করবে আমি গাঁজা ভাঙ খাই।"

"সে-ভয় করলে সাহিত্যিকদের ব্যবসা বন্ধ করতে হয়।"

"আমি তো সাহিত্যিক নই।"

"সেই জন্যই তো লোকে সহজে বিশ্বাস করবে। কাহিনী রচনা করে লোক ভোলানো তো আপনার পেশা নয়।"

"না মশায়, ও অনুরোধ করবেন না। যার রহস্য নিজেই উদ্ধার করতে পারলাম না, সে-বস্তু আমি পাঠকদের ঘাড়ে চাপাতে চাইনে।"

প্রথম দিন এই পর্যন্ত হইয়া রহিল। তারপর দিনে দিনে বারে বারে অনুরোধ উপরোধ করিয়া তাঁহার মন অনুকূল করিয়া আনিলাম, আর অবশেষে ঘটনাটির বিবরণ তিনি লিখিয়া ফেলিলেন। আমি শুনিয়া বলিলাম, "চমৎকার হয়েছে। কে বলল আপনি সাহিত্যিক নন।"

"আপনিই প্রথম বললেন যে, আমি লিখতে পারি।"

"সে-কথা জানিনে। তবে এ-ঘটনা এর চেয়ে ভালো করে প্রকাশ করা সম্ভব নয়। বরঞ্চ এর উপরে সাহিত্যিক ছলাকলা আরোপিত হলে ঘটনার স্বাভাবিক ভয়াবহতা ক্ষুণ্ন হত ছাড়া বাড়ত না। এবারে এক কাজ করুন, রচনাটি কোন কাগজে পাঠিয়ে দিন।"

"ক্ষেপেছেন নাকি?"

"ক্ষতি কী?"

"ক্ষতি এই যে লোকে গাঁজাখোর ভাববে।"

ভাবিলাম আজ আর বেশী ঘাঁটাইয়া কাজ নাই, অনুরোধ করিয়া

যখন লিখাইতে পারিয়াছি, তখন একদিন ছাপাইতে রাজি করাইতেও পারিব।

কিছুদিন ব্যাপারটা চাপা পড়িয়া ছিল, শ-বাবু কিছুদিনের জন্য কলিকাতায় চলিয়া গিয়াছিলেন। তারপরে ফিরিয়া আসিয়া একদিন রচনাটি হাতে করিয়া আমার বাড়িতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বলিলেন, "নিন, এটা আপনার কাছে রেখে দিন।"

বিস্মিত হইয়া শুধাইলাম, "হঠাৎ?"

"কোন দিন মরে যাই, কেউ জানতেও পাবে না।"

"আপনি তো কাউকে জানাতে চান না। তা ছাড়া, হঠাৎ মরতেই বা যাবেন কেন?"

তিনি কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিলেন, "তা বটে। তবে কি জানেন, লেখাটা আপনার কাছেই থাকুক, আপনার উৎসাহেই লিখেছিলাম কিনা।"

ভাবিলাম, হাতে যখন আসিল, এখন ছাপিতে পারিব। কিন্তু সেভাব প্রকাশ না করিয়া কৃত্রিম বৈরাগ্যের সহিত বলিলাম, "থাকুক, কিন্তু সর্ত কী?"

"আমি জীবিত থাকতে প্রকাশ করবেন না, মরবার পরে প্রকাশ করবার স্বাধীনতা আপনার রইল।"

তারপর একটু ভাবিয়া বলিলেন,—"কিন্তু একটি অনুরোধ, রচনার বিষয় সম্বন্ধে বাদানুবাদ হলে আপনি তাতে যোগ দেবেন না, বলবেন যে, লেখকের নিষেধ আছে।"

"বেশ তাই হবে। কিন্তু মৃত্যুর কথা এত ভাবছেন কেন?"

"নিকটতম প্রতিবেশী সম্বন্ধে সর্বদা সচেতন থাকা উচিত।"

"আচ্ছা, আপনি সচেতন থাকুন, আমি আপনার সর্ত সম্বন্ধে সচেতন থাকলাম।"

এই বলিয়া লেখাটি হাতবাক্সের তলায় সযত্নে রাখিয়া দিলাম।

হঠাৎ নিকটতম প্রতিবেশী শ-বাবুকে স্মরণ করিলেন। শ-বাবুর মৃত্যু একেবারেই অপ্রত্যাশিত; তাঁহার কোন রোগও হয় নাই, স্বাস্থ্যও ভাল ছিল, আর বয়সও পঞ্চাশের নীচে। অকালমৃত্যুর শোচনীয়তায় ঘটনাটি প্রতিভাত হইল। তখন তাঁহার কথা মনে পড়িল, মৃত্যুর সম্ভাব্যতার প্রসঙ্গ উঠিলে তিনি বলিতেন, মৃত্যুর কোন বয়স নাই।

এবারে রচনাটি প্রকাশের পক্ষে আর কোন বাধা নাই, কাজেই সেটি কাগজে পাঠাইয়া দিতেছি। বলা অনাবশ্যক হইলেও স্মরণ করাইয়া দিতে চাই যে, রচনার একটি অক্ষরও আমি অদল বদল করি নাই, কিংবা একটি কমা-সেমিকোলোনও বসাই নাই, যেমন ছিল অবিকল তেমনি আছে। কেবল শ-বাবু রচনার নাম দিয়া যান নাই, একটি নাম দরকার, তাই নামটি আমি বসাইয়া দিলাম, অবচেতন। শ-বাবুর সর্তানুযায়ী বাদানুবাদে নামিতে আমি অপারগ; যাঁহার খুশি বিশ্বাস করিবেন, যাঁহার খুশি নয় অন্যথা করিবেন; স্বয়ং লেখক এখন সমস্ত প্রশ্নের অতীত, আর তাঁহারই অনুরোধে আমারও এখন মুখ বন্ধ।

*　　*　　*　　*

বড়জামদা থেকে রওনা হয়ে ডিভিশন্যাল রেঞ্জার মিঃ শ্রীবাস্তব আর আমি একদিন দুপুর বেলা থলকোবাদ ফরেস্ট বাংলোয় এসে পৌঁছলাম। বেয়ারা বারান্দায় দু'খানা চৌকি বের করে দিল, আমরা বসলে সে চা আনতে গেল।

মিঃ শ্রীবাস্তব আরম্ভ করলেন, "জানেন মিঃ রায়, সারান্দা ফরেস্টের মধ্যে এই বাংলোটাই সব চেয়ে উঁচুতে, প্রায় আড়াই হাজার ফুট হবে।"

"কেন, এর চেয়ে উঁচু পাহাড় কি আর নেই?"

"থাকলেও সেখানে বাংলো নেই।"

তারপরে তিনি আবার শুরু করলেন, "প্রায় বছর কুড়ি আগে পার্কার নামে একজন রেঞ্জার ছিল, লোকটার সুন্দর দৃশ্যের উপরে খুব টান ছিল, তাই বেছে বেছে সুন্দর জায়গাতে সে ফরেস্ট-বাংলো তৈরি করিয়েছে। ছোটনাগরা, আঙ্কুয়া সমস্তই মনোরম স্থান, কিন্তু এই থলকোবাদের কাছে কেউ নয়।"

শ্রীবাস্তব লোকটি খুব মিশুকে আর গল্পবিলাসী। আমি গল্প করতে পারি জেনে আমার মত সামান্য ইস্কুল মাস্টারের সঙ্গে বন্ধুত্ব করেছেন। যখনি 'টুরে' বের হন, আমার ছুটি থাকলে আমাকে সঙ্গে নিয়ে যান।

আমি বললাম, "এ-জায়গা সুন্দর সন্দেহ নেই, কিন্তু সুন্দর তো কলকাতার বোটানিক্যাল গার্ডেনও। আমার এ-জায়গা কেন ভাল লাগছে জানেন?"

"কেন শুনি।"

"এ জায়গাটির মধ্যে একটি প্রচণ্ড ভয়াবহতা আছে।"

"ভয়াবহতা না থাকলে সৌন্দর্য দীর্ঘকাল মানুষকে আকর্ষণ করতে পারে না। ক্ষুদ্র সৌন্দর্য চোখ ভোলায়, মহৎ সৌন্দর্য মন ভোলায়।"

আমি বললাম, "যেমন সমুদ্র আর হিমালয়।"

"আর যেমন এই থলকোবাদ পাহাড়।"

আমি বললাম, "তা বটে, এই দেখুন ঘড়িতে এখন একটার বেশী নয়, কিন্তু রোদের তেজ দেখে মনে হচ্ছে যেন পাঁচটা বাজে।"

"পাঁচটা যখন সত্যি বাজবে, তখন ঘোর অন্ধকার হবে।"

"আচ্ছা—ঐ যে অনেক দূরে ঝাপসা কুয়াশার মধ্যে একটা সাদা রেখার মত দেখা যাচ্ছে, ওটা কি নদী নাকি?"

"কোয়েল নদী, ঘণ্টা খানেক আগে পার হয়ে এসেছি।"

এমন সময়ে বেয়ারা এসে জানাল যে, খানা তৈরি হয়েছে।

খাওয়া শেষ হলে মিঃ শ্রীবাস্তব বললেন, "মিঃ রায়, আপনি একটু বিশ্রাম করুন; কিছু সরকারী কাজ বাকি আছে, আমি সেরে নিই। বড় জোর ঘণ্টা দুই লাগবে।"

"বেশ আপনি কাজ করুন, আমি চারদিকটা একটু ঘুরে দেখি।"

"কিন্তু মশায়, খুব দূরে যাবেন না, পথ ভুল হলে বিপদে পড়বেন।"

"না না, দূরে যাব কেন, তা ছাড়া তিনটের মধ্যেই ফিরব।"

"নিশ্চয়, অন্ধকার হলেই বাঘভালুক বের হয়।"

"ঠিক আছে, আপনি চিন্তা করবেন না।"

"ওকি, আবার ঝোলা কাঁধে করেন কেন?"

আমি হেসে বললাম, "দুর্লভ ফুলের নমুনা সংগ্রহ করবার এক বাতিক আছে আমার, যন্ত্রপাতি আছে ঝুলিতে।"

"আচ্ছা আসুন, দুর্লভ ফুলের অভাব হবে না, কিন্তু খুব সাবধান।"

মোটরের চওড়া পথ ছেড়ে পায়ে চলা শুঁড়ি-পথ দিয়ে নামবার চেষ্টা করছি, হাতে আছে একটা লাঠি।

এমন সময়ে বুধন সিং সেলাম করে দাঁড়াল। বুধন সিং বাংলোর রক্ষক।

"কি ধার যা রহে হেঁ সাহাব?"

আমার আবার রাষ্ট্রভাষা ভাল আসে না, যাই হোক তবু যতটুকু পারি গুছিয়ে বললাম, "ঘুমনে কো।"

"ঘুমনে কো লায়েক জায়গা হ্যায় খাস, লেকিন উধার মৎ যাইয়ে হুজুর।"

বলে সে একটা দিক দেখিয়ে দিল। আর দশটা জায়গা থেকে কোন প্রভেদ বুঝলাম না।

কেন নিষেধ করছে, বাঘভালুক আছে না আর কিছু হবে, আর-কিছু হবেই বা-কী, এ-সব সূক্ষ্ম জিজ্ঞাসা প্রকাশ করবার মত রাষ্ট্রভাষার পুঁজি আমার নেই, কাজেই সংক্ষেপে বললাম, "ঠিক হ্যায়, উধার নেহি যায় গা!"

শুঁড়ি-পথ দিয়ে সাবধানে নামছি, কখনো গাছের ডাল ধরে, কখনো লাঠিতে ভর দিয়ে, কিন্তু মনটার মধ্যে বুধন সিং-এর নিষেধবাক্য পাক খেয়ে মরছে, 'উধার মৎ যাইয়ে সাহেব।'

প্রত্যেকটি শাল গাছ জাহাজের মাস্তুল হবার যোগ্য, বনস্পতি একেই বলে। মাটি থেকে পঞ্চাশ হাতের মধ্যে কাণ্ডের গায়ে কোথাও শাখাপ্রশাখা নেই, সরল সমান্তরাল বলিচিহ্নগুলোতে বহু বর্ষার, বহু বর্ষণের শ্যামলতা। এমন শত শত হাজার হাজার বনস্পতি। বনের বারো আনাই শাল। তাছাড়া আছে পিয়াশাল, ধ, কেঁদ, মহুয়া, অর্জুন, আর আছে দুর্ভেদ্য পাহাড়ী বাঁশের ঝাড়। সব কাঁধে কাঁধে মিলে এমন ঘন হয়ে দাঁড়িয়েছে যে, অনেক স্থানেই রোদ মাটি পর্যন্ত এসে পৌঁছায় না, সব একটানা ছায়া, ভেজা স্যাঁতসেঁতে। সব সুদ্ধ মিলে সরীসৃপের শীতস্পর্শ সৃষ্টি করেছে। মাঝে মাঝে রোদের কুচি সেই সরীসৃপের গায়েরই রঙের বাহার। কিছুক্ষণ এসব জায়গায় থাকবার পরেই অতলে তলিয়ে যাওয়ার একটা অনুভূতি জন্মায়, যেন ঐ আদিম অতিকায় সরীসৃপটার জঠরে তলিয়ে গেছি, মনে হয় যে, বিশ্বজগৎ নেই, কিন্তু আমি তবু আছি।

এ-সব বনের মস্ত একটা সুবিধা যে, তলাটা বেশ পরিষ্কার, যেদিকে খুশি যাওয়া যায়। যাচ্ছিও তাই। ইতিমধ্যেই ফুলের নমুনায় কাঁধের থলিটা বেশ ভারী হয়ে উঠেছে। যত ফুল তত প্রজাপতি। সমস্তই অজ্ঞাত, অপরিচিত; উদ্ভিদ-বিদ্যা, প্রাণিবিদ্যা এদের খবর রাখে না।

এত রঙও আছে ফুলের, এত ঢঙও আছে প্রজাপতির পাখার। আর যখন ছুয়ে মেলে, মরি মরি, হেন কবি নেই, হেন চিত্রী নেই, যাদের তুলি-কলম সে-সৌন্দর্য ধরে রাখতে পারে। কখনো ফুলগুলোকে মনে হয় প্রজাপতির ঝাঁক, কখনো প্রজাপতির ঝাঁককে মনে হয় ফুলের স্তবক। ফুল তুলছি তো তুলছিই, বোঝা বাড়ছে তো বাড়ছেই, মনের সাধ আর মেটে না। বেলা অনেকটা গড়িয়েছে, শরীর যে পরিশ্রান্ত হয়েছে তা প্রথম জানিয়ে দিল আমার পা দুটো, হঠাৎ তারা অবস্থান-ধর্মঘট ঘোষণা করল। অগত্যা একখানা কালো পাথরের উপরে একটা শাল গাছের তলায় বসতে বাধ্য হলাম। সম্মুখে একটা আগাছার শাখায় একটা অজানা ফুলের উপরে বসে অজানা একটা মস্ত প্রজাপতি দোল খাচ্ছে। ফুলটা তুলবার ইচ্ছা হলেও উঠবার শক্তি আর হল না। চুপ করে বসে রইলাম। কিন্তু মনটা হঠাৎ দোল খেয়ে উঠল ঐ প্রজাপতির মত অতীতকালের দীর্ঘশ্বাসে। আর ফুলটা? ফুলও ছিল।

আজকে আমি বিহারের এক গ্রাম্য ইস্কুলের মাস্টার। কিন্তু এ-পরিণাম কি দশ বছর আগেও কেউ কল্পনা করেছিল? বিশ্ববিদ্যালয়ের বড় বড় সব পরীক্ষাগুলো পাকা ঘোড়ার মত যখন ডিঙিয়ে ডিঙিয়ে যাচ্ছিলাম তখন শত্রু-মিত্র, আত্মীয়-পর সকলেই কল্পনা করেছিল যে, সিভিল সার্ভিসের নিরাপদ আস্তাবলে আমার যাত্রার স্পৃহণীয় পরিসমাপ্তি ঘটবে। ঘটতও তাই। এমন সময়ে ভাগ্যের শনিগ্রহের মত আমার অদৃষ্টাকাশে উদিত হল সুতপা। তার শাড়ির রাঙা পাড়ের রক্তবেষ্টনী, তার খোপার রক্তকরবীর রক্তিম ঈক্ষণ, তার লজ্জারুণ কপোলের ভাব-বলাকাবিন্যাস, তার রক্ত-অধরপুটে চুম্বনের

অর্ধস্ফুট কুড়িটি, সব মিলে কি বলব, আমি তো কবি নই, কাজেই কবির কথা ধরে কার নিয়ে প্রকাশ করি

প্রহর শেষের আলোয় রাঙা
সেদিন চৈত্র মাস
তাহার চোখে দেখেছিলাম
আমার সর্বনাশ।

সর্বনাশ বটে! রইল পড়ে আমার এম-এ পরীক্ষা দেওয়া, রইল পড়ে আমার সিভিলিয়ানী স্বর্গ, রইল পড়ে আমার ভবিষ্যৎ। আমার একমাত্র তপস্যা হল সুতপার প্রসন্নতা অর্জন।

সুতপার মন আমার উপর প্রসন্ন ছিল না, একথা বলে তারও আমার প্রতি অবিচার করতে চাইনে। হয়তো সেই প্রসন্নতার পূর্বরাগ পরিণয়ের ভাস্বরতায় একদিন পরিণত হত। কিন্তু সংসারটা এমন কত 'হলে-হতে-পারতর' ছিন্ন সুতো দিয়েই না সেলাই করা। অভিজ্ঞতার অর্থই হচ্ছে আশার সীমান্তোপলব্ধি। তারপরে একদিন বাঁশি বাজিয়ে আলো জ্বালিয়ে সুতপার বিয়ে হয়ে গেল অন্যত্র। আমিও সেদিন রাত্রে নাগপুর প্যাসেঞ্জারের বাঁশি বাজিয়ে আলো জ্বালিয়ে রওনা হয়ে এলাম এখন যেখানে ইস্কুল মাস্টারি করছি সেখানে।

আবার একদিন শত্রু-মিত্র আত্মীয়-পর অবাক হয়ে গেল, বলল, ছেলেটার ভবিষ্যৎ ছিল, কিন্তু নিজের দোষে তা খোয়ালে। আসল ব্যাপার জানল-না। তাই কেউ বলল, ছোকরাকে মার্কসিজমের ভূতে পেয়েছে, চলল গণদেবতার সেবা করতে। কেউ বলল, গান্ধী গান্ধী করেই গোল্লায় গেল, গেল গাঁওমে সেবা করতে, তাও কিনা আবার বিহারী ভূতদের গাঁও। সবাই জানে তারা অভ্রান্ত। এমনি করেই মানুষের বিচার হয়।

*　　*　　*　　*

স্বতপা বলল, "ঐ ফুলটা কী সুন্দর !"

"বেশ তো দেখো না কাছে গিয়ে।" কাছে যেতেই প্রজাপতিটা উড়ে গেল। সে অপ্রতিভ, আমি হেসে উঠলাম।

রাগের ও লজ্জার রাঙা পাড়টানা কালো দৃষ্টির গোটা দুই প্রজাপতি নিক্ষেপ করে স্বতপা বলল, "তুমি ভারী দুষ্টু।"

"কেন, প্রজাপতিকে ফুল করতে পারিনি বলে? তা স্বীকার করছি, ও-কাজ আমার অসাধ্য।"

"আগে বলনি কেন?"

"বলবার আর সময় দিলে কই?"

"এমন বোকা বনলাব!"

"যা গোড়া থেকেই আছ, তা নতুন করে আর বনবে কীভাবে।"

"নাঃ, তোমার সঙ্গে পারা অসম্ভব।"

"শোনো, রাগ করোনা, আমার কী মনে হয় জানো? ঐ প্রজাপতিগুলোও ফুল, কেবল ওদের গাছ গিয়েছে হারিয়ে, আর ওরা তাই কেবলি খুঁজে খুঁজে বেড়ায়।"

"যেমন তুমি! গাছ খুঁজে পেলে কি?"

"গাছ কী বলে জানিনে, আমার মন তো বলছে পেয়েছি।"

"আর ঐ ফুলগুলো প্রজাপতি, নয়?"

"হাঁ, গাছ পেয়ে গিয়েছে বলে আর নড়তে চাইছে না।"

"যদি ভুল গাছ হয়?"

"সংসারে অনেক সময় ভুলকেও সয়ে নিতে হয়, মানুষ তো ফুলও নয়, প্রজাপতিও নয়।"

"ইস্, আমি হলে ভুলের বোঁটা ছিড়ে উধাও হয়ে যেতাম।"

*　　　*　　　*　　　*

এসব অনেকদিন আগেকার কথাবার্তা। কার্যত দেখা গেল আমার কথাই ঠিক, ভুলকেই সয়ে নিল সুতপা, বোঁটা ছিঁড়ে উধাও হয়ে গেল না। কিংবা এমন হওয়াও অসম্ভব নয় যে, শেষ পর্যন্ত বোঁটার বাঁধন তার পক্ষে ভুল হয়নি। ঐ কথাটা ভাবতে আমার আত্মসম্ভ্রমে আঘাত লাগে বটে, কিন্তু আত্মসম্ভ্রম তো তারও আছে, ভুল হলেই বা স্বীকার করবে কেন সে!

একি, এ যে ঘোর অন্ধকার হয়ে এসেছে। ঘড়িতে মাত্র চারটা, কিন্তু এ যে সন্ধ্যার ছায়া। শ্রীবাস্তব তো বলেই দিয়েছিলেন যে এখানে পাঁচটায় বাঘ-ভালুক-বেরনো সন্ধ্যা নামে। ইস্, অনেকক্ষণ বসে ছিলাম, কিন্তু স্বীকার করতে লজ্জা নেই যে, সুতপার কথায় আমার কালজ্ঞান ও কাণ্ডজ্ঞান কিছুই থাকে না।

লাঠি ও থলি নিয়ে উঠে পড়লাম আর দ্রুত চলতে শুরু করে দিলাম। কিন্তু প্রায় আধঘণ্টা চলবার পরে হঠাৎ চমকে উঠলাম একটা অতিকায় বনস্পতি কদম গাছ দেখে। কই যাওয়ার সময়ে তো এটাকে দেখিনি। তবে কি পথ ভুল হল! গহন বনের মধ্যে একবার ঐ ধারণা মাথায় জন্মালেই সর্বনাশ! লিভিংস্টোন, স্ট্যানলিরও পথ ভুল হবেই।

একবার ডাইনে, একবার বাঁয়ে, একবার সম্মুখে, একবার পিছনে চলতে চলতে যখন একটা মুখর ঝরনার ধারে এসে পৌঁছলাম, তখন সন্ধ্যা ও পথভ্রান্তি দুইকেই স্বীকার করে নেওয়া ছাড়া গত্যন্তর রইল না। বুঝলাম আজ সম্মুখে সর্বনাশ ও রাত্রি।

পথ যখন হারিয়েছি তখন সামনে পিছনে দুই-ই সমান। কাজেই ঝরনাটা পার হলাম। ঝরনা পার হতেই একটি নাতিবৃহৎ উপত্যকায়

প্রবেশ করলাম। চারদিক উঁচু-নিচু পাহাড়ের প্রাচীর দিয়ে ঘেরা, আর ঐ ঝরনার নিত্যধ্বনিত ছড়ছড় ছুড়ছুড় শব্দ যেন উপত্যকার একটিমাত্র দরজায় নিরন্তর হুড়কো টেনে দিচ্ছে। উপত্যকাটায় ঢুকতেই সমস্ত শরীর ছমছম করে উঠল, গাঁয়ে কাঁটা দিল। এ-কয় বছর এ-অঞ্চলে বনে পাহাড়ে আমি কম ঘুরিনি, মাঝে মাঝে পথ হারাতেও হয়েছে, কিন্তু ঠিক এ-রকম অকারণ ভীতির অনুভূতি এই প্রথম। তখন রীতিমত অন্ধকার হয়ে এসেছে, চরাচরের অতল নিস্তব্ধতার মধ্যে ঐ ঝরনার কলধ্বনি যেন শিকল নামিয়ে দিয়ে তল মাপবার চেষ্টা করছে। বুঝলাম আর বাইরে থাকা নিরাপদ নয়, সন্ধ্যার সময়েই বাঘ-ভালুক হাতি বের হয় জল পান করতে, যাবে তারা ঐ ঝরনায়। পার হবার সময়ে ওর ধারে এক জায়গায় সহস্র নখের আর পায়ের দাগ চোখে পড়েছিল। ভাবলাম রাতটা একটা গাছে উঠে কাটাতে হবে। এমন অভিজ্ঞতা একেবারে নূতন নয়। আগে দু'একবার বনের মধ্যে গাছে চড়ে রাত কাটিয়েছি। একটা শক্ত উঁচু গাছের সন্ধানে চোখ যখন ব্যস্ত, দেখতে পেলাম অদূরে উঁচু একটা বস্তু। কাছে গিয়ে দেখি, অভাবিত সৌভাগ্য। কাঠের মোটা মোটা তক্তা দিয়ে তৈরি ছোট্ট একটা কুঁড়েঘর, প্রাচীরও কাঠের, ছাদও তাই। এ-রকম বন্য ঘর আমার পরিচিত। বড় বড় কাঠের ব্যবসায়ীরা মাঝে মাঝে তৈরি করে রাখে, পথ হারিয়ে গেলে বা মধ্যপথে রাত হয়ে গেলে রাত্রিযাপনের উদ্দেশ্যে। মনটা খুশী হল, যাক্, রাত্রিটা আর গাছে চড়ে কাটাতে হবে না। থলিতে টর্চ ছিল, বন ভ্রমণের কালে সর্বদাই একটা টর্চ আমার সঙ্গে থাকে। টর্চ জ্বালিয়ে ঘরটা দেখলাম। আর-দশটা বন্য ঘরের মতই, তবে দীর্ঘকাল যে এখানে কেউ রাত্রিযাপন করেছে তা মনে হল না। ভিতরে ঢুকে পড়লাম, খানকতক তক্তা সাজানো, বসে শুয়ে

রাত্রি কাটানো যায়, দরজার ফাঁকটা বন্ধ করবার জন্যে কাছেই পড়ে রয়েছে আর খানকতক ছোট বড় কাঠের টুকরো। আর বাইরে থাকা নিরাপদ নয় মনে করে দরজার ফাঁকটা যথাসম্ভব বন্ধ করে দিলাম কাঠের টুকরো সাজিয়ে। সবটা বন্ধ হল না, উপরে আধহাত খানেক ফাঁক রইল, ভিতরে কাঠের তক্তার উপরে বসলে বাইরের দৃশ্য বেশ চোখে পড়ে। শীতকাল, তাই সাপখোপের ভয় ছিল না। ভাবলাম রাতটা নিরাপদে কাটবে।

শক্ত নিরাবরণ কাঠের তক্তার উপরে বসলাম। কষ্ট হচ্ছিল। মনে করলাম গাড়ির তৃতীয় শ্রেণীর বেঞ্চিতে যেন বসে আছি। জানলার ফাঁক দিয়ে বাইরের তরল অন্ধকার, অরণ্য ও পাহাড়ের জমাট অন্ধকার, গোটা দুই তারার ফুটকি চোখে পড়ছে, তবে এ রেলগাড়িটা রয়েছে দাঁড়িয়ে, এই যা প্রভেদ।

একটু স্থির হয়ে বসতেই নিজের অবস্থা মনে পড়ল, আর রাগ হল নিজের উপরেই। কী দরকার ছিল থলকোবাদ বাংলোয় আসবার, কী দরকার ছিল বাংলো থেকে একাকী বের হবার। শ্রীবাস্তব না জানি কত ভাবছে, আর বুধন সিং তো স্পষ্টই নিষেধ করেছিল। কিন্তু এই উপত্যকাটাই কি তার উদ্দিষ্ট—'উধার'? উপত্যকায় ঢুকতেই গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠেছিল, মনে পড়ল, মনে পড়ায় আবার গা ছম ছম ক'রে উঠল।

গহন অরণ্যে একাকী রাত যে না কাটিয়েছে তাকে সে-অভিজ্ঞতা বোঝানো যাবে না। দিনের বেলায় যে-বন নিস্তব্ধ, রাতে সেখানে যে কত রকম শব্দ ওঠে, দিনের বেলায় যে-বন নির্জন, রাতে সেখানে যে কী ঠাসাঠাসি, এ-সব রহস্য বলে বোঝাবার নয়। একবার বাইরে টর্চের আলো ফেললাম, অনন্ত কালোর পর্দা একটুখানি ফাঁক হল। বেবাক

শূন্য, ধারে কাছে কোথাও গাছপালা নেই। শূন্যতা যে কত গুরুভার, এই রকম স্থানে এই রকম সময়ে বুঝতে পারা যায়।

*　　　*　　　*　　　*

"সুতপা, আজ তোমার ঠোঁট দু'খানি বড় সুন্দর দেখাচ্ছে।"

"তোমার সব তাতেই বাড়াবাড়ি।"

"বাঃ, দোষ করলে তুমি, আর রাগ আমার উপরে।"

"বাঃ রে, আমি কোথায় দোষ করলাম!"

"ঠিক তুমি নও, তোমার ঠোঁট দুটি। ও একই কথা।"

"তারই বা কী দোষ?"

"নইলে অমন সুন্দর দেখাতে গেল কেন?"

"তাতে দোষটা কিসের শুনি।"

"অপরকে প্রলুব্ধ করছে, abetment, আইনে সেটাও দণ্ডনীয়।"

"তোমার যত বাজে কথা।"

"ঠিক, সে-দোষ স্বীকার করছি, এবারে কাজে নামা যাক্।"

হঠাৎ আমার মুখ নত হয়ে পড়ল তার ঈষদুন্নত অধরোষ্ঠের দিকে। অর্ধস্ফুট গোলাপের কুঁড়িটা যখন উচ্ছিন্ন হবে, ঠিক তার পূর্ব মুহূর্তে দু'জন দু'দিকে ছিটকে সরে গেলাম। ফিটন গাড়িখানা পাথরে হুঁচোট খেয়েছে। নলের রাজহংস দময়ন্তীর কাছে এসেই ফিরে গেল, হল না হাতে পত্র সমর্পণ। দময়ন্তীর মুখমণ্ডলে একসঙ্গে পর পর আশাভঙ্গ, উল্লাস, নৈরাশ্য, আত্মধিক্কার প্রভৃতি বিচিত্র ভাবের সা রে গা মা গেল খেলে।

"নাঃ, তোমাকে আর বিশ্বাস নেই, গাড়িতে কি করতে কী করে বসবে।"

"এসো তবে বাড়ি বাঁধি।"

সে মুখ ফিরিয়ে নিল।

*　　　*　　　*　　　*

এমন সময়ে বিকট একটা গর্জন উঠ্‌ল। অনভিজ্ঞে শুনলে ভাববে গাধা ডাকছে। যা ডাকছে তা হচ্ছে বুনো হাতি এবং তা অদূরেই। আর ওরা যে দল বেঁধে ছাড়া নড়ে না, একথা কে না জানে। ওরা চলেছে ঝরনায় জলপান করতে।

হাতির ডাক থেমে যেতেই বন আবার দ্বিগুণ নির্জন হল, শোনা গেল টুং টুং ধ্বনি, গোরুর গলার ঘণ্টায় যেমন আওয়াজ ওঠে। ও এক রকম পাহাড়ী পাখি ডাকছে।

ক্রমে সারা দিনের ক্লান্তিতে ঘুম পেতে লাগল, আর অল্পক্ষণের মধ্যেই কাঠের দেয়ালে হেলান দিয়ে ঘুমিয়ে পড়লাম, থার্ড ক্লাস গাড়ির কামরায় যেমন অনেকবার ঘুমিয়েছি।

*　　　*　　　*　　　*

অচেনা গাছে অচেনা ফুল। গাছটি সুন্দর, কিন্তু ফুলের বোধকরি তুলনা হয় না। অর্ধবিকশিত ফুলটির অর্ধোন্মোচিত পাঁপড়িগুলোর কী রঙ, কী ভঙ্গিমা, আর মৃদু সূক্ষ্ম সুগন্ধই বা কত। সুস্ফুট ফুলে মহিমা আছে, কুঁড়িতে সৌন্দর্য আছে, কিন্তু অর্ধস্ফুট ফুলের রহস্য হার মানিয়েছে আর সবকিছুকে। যতই হাত বাড়াই ফুলটি সরে যায়, বাতাসের এ কেমন লীলা। আর এমনতর মেজাজী ফুলও তো দেখিনি। একটু বেশী চেষ্টা করে যেই হাত বাড়িয়েছি, অমনি—

"গাড়ির মধ্যে এসব কী হচ্ছে?"

"তুমি আবার ফুল সেজেছিলে কেন?"

"ফুল সেজেছিলাম? সে আবার কী।"

"মনে হচ্ছিল, তুমি একটা গাছ হয়ে গিয়েছ, আর তোমার ঠোঁটে ফুটে রয়েছে একটা অচেনা সুন্দর ফুল।"

"একটা কথা সত্যি করে বলবে? আমাকে সত্যিই কি খুব সুন্দর লাগে তোমার?"

দুই ফুসফুসে এক আকাশ বাতাস টেনে নিয়ে দেহের সমস্ত শক্তি দিয়ে চিৎকার করে উঠলাম, "সুন্দর, সুন্দর, তুমি অপূর্ব সুন্দর।"

সেই প্রচণ্ড চেষ্টায় ধড়ফড় করে জেগে উঠলাম কাঠের আসনের উপরে। চিৎকার বোধহয় সত্যিই করেছিলাম, প্রতিধ্বনির শেষ রেশটুকু তখনো মিলিয়ে যায়নি, সমস্ত অরণ্য বোধ করি চকিত চমকিত হয়ে উঠেছিল অতৃপ্ত প্রণয়ীর ব্যর্থ কামনার নিষ্ফল উল্লাসের অদম্য ক্রন্দনে। বুকের মধ্যে একটা দুর্দম জ্বালা, দুর্মদ ক্ষুধা, দুস্তর আকাঙ্ক্ষা তোলপাড় করতে লাগল। মনে হল, আমার আত্মার সেই অসহ্য উত্তাপে চরাচর সন্তপ্ত হয়ে উঠেছে, সেই ব্যর্থ বাসনার দুর্বার বহ্নি তীক্ষ্ণ সূচীমুখে সমস্ত অরণ্যকে বিদ্ধ করছে আর আমার অন্তর থেকে যেন ক্ষণে ক্ষণে বিদ্যুৎ-জ্বালা নিষ্কাশিত হয়ে সমগ্র আকাশটাকে ভিতরে ভিতরে তাতিয়ে তুলেছে। যে-অরণ্যে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, আর যে-অরণ্যে জেগে উঠলাম, এ দুই যেন ভিন্ন স্থান।

আলো জ্বেলে ঘড়ি দেখলাম। কেবল দশটা। মনটা দমে গেল। এখনো অন্তত আট ঘণ্টা এই গুমটিতে চুপ করে বসে থাকতে হবে।

একটা সিগারেট ধরালাম। অনেকক্ষণ একভাবে বসে থেকে শরীর আড়ষ্ট হয়ে গিয়েছিল, তাই উঠে দাঁড়ালাম, আর দরজার কাছে এসে দাঁড়ালাম। দরজার ফাঁক দিয়ে বাইরের দিকে দৃষ্টি পড়তেই চমকে উঠলাম। এটা কী হল? আবার ভাল করে তাকালাম। সত্যিই তো, এ কী, এ কেমন হল? সমুখের মাঠ ফাঁকা ছিল, এখন গাছপালায় একেবারে ভর্তি। ব্যাপার কি? বাইরে টর্চের ছটা ফেললাম। না, সমস্ত ঠিক আছে, মাঠ ফাঁকা, আমার চোখেরই ভুল।

কিন্তু যেমনি আলো নিভিয়েছি অমনি মুহূর্তে সমস্ত মাঠখানা ঠাসাঠাসি ভর্তি হয়ে গেল গাছপালায়। আবার আলো ফেললাম, না, মাঠ ফাঁকা। আলো নিভোতেই মাঠ উঠল ভরে। এ যেন আমার সঙ্গে আর বনের অদৃশ্য শক্তির সঙ্গে একটা লুকোচুরি খেলা। লোকালয়ে বসে এ-কাহিনী পড়লে কী মনে হবে জানি না, কিন্তু সেই আদিম অরণ্যের কোলে আদিম অন্ধকারে একাকী বসে এই অদ্ভুত দৃশ্য দেখে সেই মাঘ মাসের শীতেও আমার কপালে ঘাম দেখা দিল।

ভাবলাম পড়ে মরুকগে, মাঠের মত মাঠ থাকুক, আমার চিন্তার কারণ কী, আমি তো আছি ঘরের মধ্যে। এমন সময়ে আর-এক কাণ্ড ঘটল। ঐ গাছপালাগুলোর মধ্যে ঝড় উঠল। ডালপালার এমন মাতামাতি, গাছপালার এমন লুটোপুটি আর কখনো দেখিনি, অথচ চরাচর নিঃশব্দ। চারদিক এমন নিস্তব্ধ যে হাতঘড়ির আওয়াজ শোনা যাচ্ছিল। ভাবলাম ঝড় এখনি ঘরটার উপরে এসে পড়বে। কিন্তু ঝড় ঘরটার কাছেও এল না। আলোর ছটা ফেললাম। কোথায় বা ঝড়, কোথায় বা গাছপালা, ফাঁকা মাঠ নীরব, নিস্তব্ধ, অন্ধকার। আলো নিভতেই আবার ঝড়ের মাতামাতি শুরু হয়ে গেল। সিগারেট ধরাবার জন্যে দেশলাই জ্বাললাম, তার শিখাটি এতটুকু কম্পিত হল না, অথচ দশ গজ দূরেই মহাপ্রলয় চলছে। এবারে আতঙ্ক শুরু হল। জীবনে কখনো না কখনো সকলেই ভয় পেয়েছে, কিন্তু এ-আতঙ্কের প্রকৃতি বোঝাতে পারব না। একবার মনে হল বুধন সিং "ওদিকে" যেতে নিষেধ করেছিল, আমি কি তবে পথ ভুলে তার নিষিদ্ধ "ওদিকে" এসে পড়েছি? অবশ্য কেন নিষেধ করেছিল তা বলেনি। আবার মনে পড়ল, এ-অঞ্চলের কোন কোন লোকের মুখে শুনেছি যে, বনের মধ্যে এক আধটা জায়গা আছে ভারী "খারাপ।" প্রথমে ভাবতাম

জন্তু-জানোয়ারের ভয়ের জন্যই "খারাপ।" একবার এক বুড়োকে চেপে ধরায় সে বলেছিল যে, এই সব জায়গায় নানারকম "অদ্ভুত" কাণ্ড ঘটে। কী "অদ্ভুত" সে বলতে পারল না। এখন মনে হল সে জানত, কেবল ইচ্ছে করেই বলেনি। ভাবলাম বাইরে যা খুশি ঘটুক, আমার ঘরটির উপরে যতক্ষণ না হামলা হচ্ছে, আমার ক্ষতি কী? তারপরে ভাবলাম বাইরের দিকে আর তাকাব না, তা হলেই ভয়ের কারণ কেটে যাবে। কিন্তু তাও কি কখনো সম্ভব? কৌতূহল ভিতরে ভিতরে ঠেলা মারতে লাগল, ভয় পাব জেনেও তাকাতে বাধ্য হলাম। সেই ঝড়, সেই মাতামাতি, কিন্তু আমার উপরে কোন প্রভাব নেই। যেন ছবির ঝড়, ছবির মাতামাতি। যেন ঐ ভূখণ্ড আর আমার কুটির ভিন্ন জগতের বস্তু। দুয়ের ভাষা ভিন্ন, দুয়ের মধ্যে চলাচলের পথ বন্ধ—তাই ওর প্রভাব এখানে এসে পৌঁছচ্ছে না। এ-সব কথা ঠিক তখন মনে হয়েছিল, না পরে মনে হয়েছে, এখন বলতে পারব না, কারণ তখন যে-দৃশ্য দেখেছিলাম এক ঝাপসা কাচের মধ্যে দিয়ে, এখন তা আরো অস্পষ্ট হয়ে এসেছে।

এবারে মনে হল হঠাৎ উপত্যকাখানা নানা প্রাণীর চলাফেরায় সচল হয়ে উঠেছে। তবে কি বাঘ-ভালুক বের হল নাকি? ঐ সব শ্বাপদের সম্ভাবনায় সাধারণত মানুষের মন খুশী হয় না সত্য, কিন্তু আমি কেমন যেন হাল্কা বোধ করলাম। মনে হল, ওরা যতই ভয়ঙ্কর জীব হোক. না, তবু ওরা আমার মতই রক্ত-মাংসের জীব, ওরা পার্থিব, ওরা যে আমার আপন জন! এই অপার্থিব, বিভীষিকার চেয়ে ওরা ঢের বেশী কাম্য। কিন্তু একটু পরেই বুঝলাম যে, আজ অদৃষ্ট এমনি অকরুণ যে, সে-সান্ত্বনাটুকুও আমার ভাগ্যে নেই। ওরা তো বাঘ-ভালুক নয়, তার চেয়ে আকারে অনেক বৃহৎ। হাতি? না, হাতিও

নয়, কারণ এদের আকৃতি কোন প্রাণীর সঙ্গে মেলে না। প্রাগৈতিহাসিক অতিকায় যে-সব জন্তুর ছবি বইয়ে দেখা যায়, এরা যেন সেই সব বিস্মৃত জগতের বিচিত্র জন্তু। কিন্তু ঐ ঝড়ের মত এরাও নীরব। ঐ নিঃশব্দ ঝড়ের লুটোপুটির মধ্যে এরা নিঃশব্দে ছুটোছুটি করতে লাগল। আলোর ছটা ফেলে যে পরীক্ষা করব, সে-শক্তিও আর ছিল না। মনটা তখনো সম্পূর্ণ বিকল হয়নি। একবার মনে হল, সবটাই তো একটা দুঃস্বপ্ন নয়? তা কী করে হবে? এই তো জেগে আছি, চোখে পলক পড়ছে, হাতে সিগারেট। না, স্বপ্ন নয়।

মনে হল কোন রুদ্ধ কারাগারের লোহার দরজা খুলে গিয়েছে, আর অতল নিতল থেকে উঠে আসছে দলে দলে সেই সব চিন্তা, অনুভূতি, আকাঙ্ক্ষার অর্ধসমাপ্ত অস্পষ্ট মূর্তি জাগ্রত চৈতন্য যাদের পূর্ণাঙ্গ করে তুলবার সুযোগ পায়নি।

এমন সময়ে মনে হল, উপরের ঐ বিরাট কালো আকাশখানা কুমোরের প্রকাণ্ড চাকের মত হঠাৎ বোঁ ক'রে একবার ঘুরে উঠল, আর তারপরেই ঘুরতে ঘুরতে ভীম বেগে নীচে নামতে লাগল, দিগন্তের অস্পষ্ট পাহাড়গুলো তরঙ্গিত হতে লাগল, আর মাঝখানের ঐ উপত্যকায় অলৌকিক ঝড়ের ও জানোয়ারের মাতামাতি তো চলেইছে। আর সমস্ত কিছুকে চরম ভয়াবহতার শেষ সীমায় পৌঁছে দিয়েছে অপার্থিব একটা নিঃশব্দতা। মহামেরুর, মহাশূন্যের বা মৃত্যুর পরের নিঃশব্দতা হয়তো এই রকম।

এমন সময়ে একটা আর্ত কাতর বেদনার বহ্নিময় চিৎকার কোন্ অন্ধকার থেকে নিক্ষিপ্ত হয়ে আমার মনের মধ্যে আমূল নিহিত হল। জাগ্রত অবস্থারও নানা স্তর আছে, সেই প্রচণ্ড সংঘাতে আমি যেন জাগরণের সৌধচূড়া থেকে একেবারে মাটিতে নিক্ষিপ্ত হলাম। এ কার

চিৎকার? নারীকণ্ঠ? কোথায়? এখানে? কে? অনেকগুলো প্রশ্ন এক সঙ্গে ছুটে চলে গেল ঝড়ের মুখে বিপন্ন হাঁসের সারির মত। তাদের পক্ষ-বিধুনন ভাল করে না মিলোতেই সেই অপার্থিব ভূখণ্ডের কোন্ নেপথ্য থেকে ছুটে চলে এল ব্যাঘ্রভয়ভীতা বিপন্না হরিণীর মত ধাবমানা এক নারীমূর্তি। সেই নিঃশব্দের জগতে তার কাতর কণ্ঠ যেন শব্দের বিদ্যুৎ, সেই অপার্থিব কালোর মধ্যে বিস্রস্তবসন তার শুভ্র কমনীয় তনু ঝড়ের বেগে চালিত অসম্পূর্ণ একটি চন্দ্রকলা। আবার আর্ত কণ্ঠস্বর। ওগো, এ-কণ্ঠস্বর আমার জন্ম-জন্মান্ত জানে, এ-কণ্ঠস্বরে আমি সহস্র মৃত্যুর সমাধি থেকে জেগে উঠব, ঐ রমণীয়, কামনীয়, স্পৃহণীয় তনু লক্ষ জনতার মধ্যেও আমি চিনে নিতে ভুল করব না। এ যে সুতপা। ঐ আর্ত কণ্ঠের অগ্নিময় স্পর্শে মুহূর্তমধ্যে পূর্ণ সম্বিতে ফিরে এলাম। সুতপা! সুতপা!

দরজার তক্তাগুলো খুলে ফেলবার চেষ্টা করছি, এমন সময় দেখলাম অতিকায় একটা মনুষ্যমূর্তি—দুর্ভাগ্যের মত তাড়া করে আসছে। তবে ওরই কাছ থেকে পালাচ্ছে সুতপা।

দরজার তক্তাগুলো সরানো হয়ে গিয়েছিল, ছুটে বেরিয়ে পড়লাম। সুতপা! সুতপা!

ঐ যে দূরে ছুটে চলেছে সে জ্যোৎস্নালেখার মত, ঐ যে পিছনে ছুটে চলেছে অতিকায় মূর্তি রাহুটার মত। আর সবার পিছনে, অনেক পিছনে আমি।

প্রাণপণে ছুটছি, খানাখন্দ, উঁচুনিচু, পাথর ঢিবি ডিঙিয়ে, তবু ধরতে পারি কই। ঐ অতিকায় দানবটাকে ধরতে পারলেই বা কী করতে পারতাম। কিন্তু সে কথা কি তখন ভেবেছিলাম। আর কিছু না পারি, নিজের দেহ দিয়ে ওর পথরোধ করে পড়ে থাকব, সুতপা

সময় পাবে পালাবার। দৌড়, দৌড়, আরো জোরে, আরো, আরো! এক-একবার কাছে এসে পড়ি দানবটার, দেখতে পাই ওর উলঙ্গ, বীভৎস, রোমশ দেহ, আবার যায় এগিয়ে। লোকটা সচেতন হয়ে উঠেছে যে, আমি পিছনে তাড়া করেছি। হঠাৎ এক লাফে অনেকটা এগিয়ে গিয়ে সে ধরে ফেলল সুতপার কোমর, আর অনায়াসে তাকে শূন্যে তুলে নিল। তারপরে আর এক লাফে অন্তর্হিত হল এক ঝোপের আড়ালে। আমিও প্রাণপণে গতি বাড়িয়ে দিয়ে যখন পৌঁছলাম সেখানে, দেখলাম স্খলিতবসনা, সমুদ্রফেনসুকুমারতনু সুতপা মূর্ছিতপ্রায়, আর ঐ অতিকায় নর-দানবটা তার মুখের উপরে ঝুঁকে পড়েছে। আমার পায়ের শব্দ শুনে লোকটা মুখে তুলে চাইল আমার দিকে। সেই বাসনাপঙ্কিল অধরোষ্ঠ, কামনাকুটিল মুখমণ্ডল, সেই লুব্ধলোলুপ রসনা, আর সেই অতি ক্ষুধার্ত, কামার্ত, অন্তর্জ্বালা-দীপ্যমান দুই চক্ষু। আমি চমকে উঠলাম, এ যে আমার মুখ! আয়তনে আমার চেয়ে অনেক বড়, শক্তিতে আমার চেয়ে অনেক প্রবল, কিন্তু এ যে আমারই এক অবিকল প্রতিকৃতি তাতে আর সন্দেহ নেই। মাথা ঘুরে উঠল, মূর্ছিত হয়ে পড়ে গেলাম, কিন্তু তার আগে দেখতে পেলাম ঐ বীভৎস মুখ নত হয়ে পড়ল সুতপার অধরোষ্ঠের উপরে, আর সবলে ছিন্ন করে নিল অর্ধস্ফুট রক্ত-গোলাপের সেই স্পর্শভীরু কুঁড়িটি।

যখন জ্ঞান হয়, দেখি ভোরের আলোয় পায়ের কাছে দাঁড়িয়ে আছেন শ্রীবাস্তব, পাশে বুধন সিং।

পূর্বাপর হঠাৎ স্মরণে এল না ; শুধালাম, "এখানে কেমন করে এলাম।"

শ্রীবাস্তব বললেন, "সে-সব পরে হবে, এখন চুপ করে থাকুন।"

শ্রীবাস্তবের আদেশে চাপরাশিরা একখানা স্ট্রেচারের মত বানিয়ে ফেলল, আর আমাকে তার উপরে শুইয়ে দিয়ে সকলে মিলে সযত্নে বহন করে নিয়ে চলল—খলকোবাদ ডাক-বাংলোয়।

আমার অস্পষ্টভাবে মনে পড়ে গেল, আমার মূর্ছার সঙ্গে কোথায় যেন একটা যোগ আছে সুতপার। কিন্তু কী যোগ, কী বিবরণ কিছুই মনে পড়ল না, মনটা অন্ধকারের মধ্যে ঘুরপাক খেতে লাগল।

এমন সময় কানে এল, বুধন সিং চাপা গলায় শ্রীবাস্তবকে বলছে, "সাহাব কো ইধার আনা হাম মানা কর দিয়ে থে।"

সেকেন্দর শা-র প্রত্যাবর্তন

দিগ্‌বিজয়ী সেকেন্দার শা পাঞ্জাব বিজয় করিয়া হঠাৎ কেন ভারত ত্যাগ করিলেন, ইতিহাসের এটি একটি অমীমাংসিত সমস্যা। এ পর্যন্ত সর্বজনস্বীকৃত কোন সমাধান পাওয়া যায় নাই, নানা মুনির নানা মত। মগধরাজ্যের বিক্রমের সংবাদ, মাসিডন হইতে ভারতের দূরত্ব, নব-বিজিত রাজ্যসমূহে বিদ্রোহ, সৈন্য দলের অসন্তোষ প্রভৃতি নানা-বিধ কারণ বা সবগুলি একত্রে ঐতিহাসিকগণকে সন্তুষ্ট করিতে পারে না। সেকেন্দার শা-র প্রতিভা, প্রভাব ও বীরত্ব এমন বিরাট ছিল যে, পূর্বোক্ত কারণগুলি সত্য হইলেও তাঁহার পক্ষে অলঙ্ঘ্য বাধা ছিল না। সম্প্রতি আফগানিস্থানের একটি গুহাচৈত্য হইতে যে প্রাচীন গ্রীক পাণ্ডুলিপি উদ্ধার হইয়াছে, তাহাতে সেকেন্দার শা-র আকস্মিক ভারত ত্যাগের কারণ বর্ণিত হইয়াছে। লেখক সেকেন্দার শা-র অনুগামী একজন গ্রীক সৈনিক, নাম পেস্কাডস্ এরিওফিস্, অর্থাৎ এরিওফির পুত্র পেস্কাডস্। তিনি সেকেন্দার শা-র সহপাঠী ছিলেন, দু'জনেই বিখ্যাত এরিস্‌টটেলের ছাত্র। পেস্কাডস্ সেকেন্দার শা-র দিগ্‌বিজয়ের বিবরণ লিখিয়াছিলেন তৎকালীন ইতিহাস হইতে জানিতে পারা যায়। কিন্তু তাঁহার বিবরণ এ পর্যন্ত অজ্ঞাত ছিল, কিছুকাল আগে পাণ্ডুলিপি আকারে তাহা পূর্বোক্ত চৈত্যগুহা হইতে আবিষ্কৃত হইয়াছে। পণ্ডিতেরা বলিতে পারেন না যে, পেস্কাডসের পাণ্ডুলিপি কিভাবে এই বৌদ্ধগুহায় আসিল। এই পর্যন্ত অনুমান করা চলে যে, সেকেন্দার শা-র সাম্রাজ্যের যে অংশে আফগানিস্থান পড়িয়াছিল, পেস্কাডস্ সেখানে কোন রাজ-

কার্যে নিযুক্ত হইয়া থাকিবেন ; কিংবা এমন হওয়াও অসম্ভব নহে যে, সেকেন্দার শা-র মৃত্যু হইলে আফগানিস্থানে যখন বিদ্রোহ হইল, তখন পেস্কাডস্ অন্যান্য গ্রীক রাজপুরুষগণের সহিত এই গুহায় আশ্রয় লইয়া থাকিবেন। বৌদ্ধগণ গ্রীকবিদ্বেষী ছিল না। খুবই সম্ভব যে, রাজভবন পরিত্যাগ করিবার সময়ে পেস্কাডস্ অতি প্রিয় ডায়ারীখানি সঙ্গে আনিয়াছিলেন। যাহা হোক, পেস্কাডসের পরিণাম বর্ণনা আমাদের উদ্দেশ্য নয়, ডায়ারীর যাবতীয় বিষয় আলোচনাও আমাদের উদ্দেশ্য নয়, যে অংশে সেকেন্দার শা-র ভারত ত্যাগের কৌতূহলজনক কারণ বিবৃত হইয়াছে, তাহাই আমাদের লক্ষ্য। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, পেস্কাডসের সম্পূর্ণ পাণ্ডুলিপি এখন সোভিয়েট রাশিয়ার অন্তর্গত কাজান (Kazan) বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে রক্ষিত হইয়াছে।*

২

পেস্কাডস্ লিখিতেছেন—

পাঞ্জাব বিজয় সম্পন্ন হইলে, সম্রাট পূর্বভারত জয়ের জন্য প্রস্তুত হইলেন। তিনি সংবাদ সংগ্রহ করিয়াছিলেন যে, পাঞ্জাব ও মগধের মধ্যে কোন শক্তিশালী রাষ্ট্র নাই। তিনি জানিতেন যে, পরীক্ষা হইবে মগধে পৌঁছিয়া, কারণ মগধরাজ যেমন বীর, মগধরাজ্য তেমনি শক্তিশালী। কিন্তু যিনি পারস্য সাম্রাজ্য অবহেলাক্রমে বিধ্বস্ত

* পাণ্ডুলিপির ফরাসী ও ইংরাজি অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। তন্মধ্য হইতে আমরা প্রয়োজনীয় অংশের সার সঙ্কলন করিয়া দিলাম। স্থানাভাববশতঃ সর্বত্র আক্ষরিক অনুবাদ করা সম্ভব না হইলেও কোথাও মূল লেখকের অনভীষ্ট ভাব আমদানি করি নাই।

করিয়াছেন, মগধরাজ্য যতই শক্তিশালী হোক না কেন, তাঁহাকে বিচলিত করিতে পারে না। নূতন খ্যাতির আশায় নূতন লুণ্ঠনের লোভে সৈন্য ও সেনাপতিগণ উল্লসিত হইয়া উঠিল। সম্রাট ঘোষণা করিয়া দিলেন যে, আগামীকল্য প্রাতে অজেয় গ্রীক বাহিনী পূর্বদিকে যাত্রা করিবে। এমন সময়ে, সেদিন অপরাহ্ণে এরূপ একটি ঘটনা ঘটিল, যাহাতে গ্রীক বাহিনীর নূতন বিজয়াভিযান তো বন্ধ হইলই, এমন কি পৃথিবীর ইতিহাসে অধ্যায় পরিবর্তনের যে সুচনা দেখা দিয়াছিল তাহাও অকালে অপ্রত্যাশিত উপসংহারে পৌঁছিল।

সেদিন অপরাহ্ণে সম্রাট যখন সেনাপতিগণসহ শিবিরে বসিয়া আগামী দিনের কর্মসূচী আলোচনা করিতেছিলেন, তখন একজন সেনানী শিবিরে ঢুকিয়া সম্রাটকে অভিবাদন করিয়া দাঁড়াইল।

সম্রাট শুধাইলেন—কি খবর?

দূত বলিল—সম্রাট একজন বিদেশী ধরা পড়েছে।

বিদেশী? কোন্ দেশী? ভারতীয়?

চেহারায় ও পোষাকে তো মনে হয় না, ভারতীয় তো অনেক দেখেছি।

লোকটা বলে কি?

বুঝ্‌তে পারি না।

ভাষা অজ্ঞাত।

আজ্ঞে না, ভাষা দুর্বোধ্য নয়, ভাবটাই কেমন গোলমেলে।

কি করছিল সে?

গ্রীক বাহিনীর মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছিল।

এখন কোথায়?

তাঁবুর বাইরে পাহারাধীন। আদেশ হয়তো আনি।

ক্ষতি কি। নিয়ে এসো।

সেনানী প্রস্থান করিল এবং অল্পক্ষণ মধ্যে কথিত বিদেশীকে লইয়া সম্রাটের কাছে ফিরিয়া আসিল।

সম্রাট ও সেনাপতিগণ দেখিল যে,বিদেশী যতদূর সম্ভব কৃশ,নাতিখর্ব, নাতিদীর্ঘ। পরনে মূল্যবান রঙিন পট্টবাস; সম্মুখে অকারণ একটা কুঞ্চিত অংশ মাটি পর্যন্ত দোদুল্যমান; গায়ে চিত্র-বিচিত্র রঙিন আঙরাখা, পায়ে ময়ূরপঙ্খী পাদুকা; কণ্ঠে সূক্ষ্ম স্বর্ণহার, কানে কুণ্ডল, অনাবৃত মস্তকে কেশদাম তরঙ্গিত, কোটরগত চক্ষুতে এক সঙ্গে ভীতি, চাতুরী ও কৌতূহল; নাসাগ্র আত্মম্ভরিতায় উদ্ধত; সূক্ষ্ম চিবুকে চারিত্রিক দৃঢ়তার ও মানসিক স্থিরতার অভাব; অসমান দন্তপঙ্‌ক্তি তাম্বুলরাগে রঞ্জিত; জীর্ণ তম্বুরার মতো দীর্ঘ ও মলিন কণ্ঠে অনেকগুলি শিরা-উপশিরা দৃশ্যমান; আর দেহটি বাতাহত গুবাকতরুর মতো সর্বদা যেন কম্পিত, একদণ্ড স্থির হইয়া থাকে না।

সম্রাট অনেক ভারতীয় দেখিয়াছেন, তাহাদের দেহ ও চরিত্রের বলিষ্ঠতা সম্রাটের শ্রদ্ধা ও বিস্ময় আকর্ষণ করিয়াছে, কিন্তু ইতিপূর্বে তিনি কখনো এরূপ জীব দেখেন নাই। তিনি যুগপৎ কৌতূহল ও কৌতুক অনুভব করিলেন, ভাবিলেন এ লোকটাও যদি ভারতীয় হয়, তবে বুঝিতে হইবে ভারত সম্বন্ধে এখনো কিছুই জানা হয় নাই, কি আশ্চর্য এ দেশ! তারপরে তিনি শুধাইলেন—

তোমার নাম কি?

বিদেশী বলিল—গৌড়দাস।

নিবাস?

ভারতের পূর্বাঞ্চলে।

মগধে?

মগধেরও পূর্বে।

আর একটু স্পষ্ট করে বলো।

এবার বিদেশী বলিল—

'মগধের পূর্বদিকে জাহ্নবীর তীর
গৌড়বাসীরা সেথা রচে সুখনীড়।'

ওকি আবার পদ্য কেন?

আমাদের দেশে গদ্য নাই, আমাদের ধারাপাত, শুভঙ্করী হিসাব-কিতাব সবই পদ্যে। শুনবেন?

উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া সে আবৃত্তি করিয়া উঠিল—

'কুড়বা কুড়বা কুড়বা লিজ্জে
কাঠায় কুড়বা কাঠায় লিজ্জে।

তাহার পদ্য শুনিয়া হোমার সোফোক্লিসের কাব্যে অভ্যস্ত গ্রীকগণ হাসিয়া উঠিল। জাতীয় পদ্যের অসম্মানে গুবাকতরু আরও ঘন ঘন দুলিতে লাগিল।

সম্রাট বলিলেন, তোমার পদ্য শুনলাম, উত্তম, কিন্তু এবারে সত্য করে বলো তো যুবক এখানে কেন এসেছিলে?

যুবক বলিল—মাইরি আমার, রসিকতা করবার আর জায়গা পাওনি, সত্যি কথা বলি, আর ধরে ঝুলিয়ে দাও।

সত্য কথা না বল্‌লেও ধরে ঝুলিয়ে দিতে পারি।

দিলেই হ'ল। আমার ওজন কত জানো? ঝুলেই থাকব, মাটিতে পড়বার মতো ভারটুকুও নেই শরীরে। মিছে দড়ির অপব্যয় হবে।

তাহার অভদ্রোচিত উত্তরে বিরক্ত হইয়া সেলুকাস বলিয়া উঠিল, যুবক সাবধানে কথা বলো, সম্মুখে সেকেন্দার শা।

এবারে যুবক বদ্ধমুষ্টি নাকের কাছে তুলিল, বলিল, জয় হোক সম্রাটের।

সেলুকাস শুধাইল, ঘুষি তুল্‌লে কেন?

বিস্মিত যুবক বলিল—ঘুষি কোথায়? ওটা অভিবাদনের গৌড়ীয় রীতি।

তারপরে সে বলিল—এতক্ষণ জানতাম না আপনার পরিচয়, তাই কিছু উদ্ধত ব্যবহার করেছি। আমরা আবার শক্তের ভক্ত, নরমের যম কিনা।

তোমরা মানে! তোমাদের দেশের সকলেই তোমার মত?

আজ্ঞে, বেবাক সব।

ভাবিয়ে তুল্‌লে যুবক।

আজ্ঞে, সে কথা নেহাৎ মিথ্যে নয়। আমরা স্বয়ং বিধাতার শিরঃপীড়া।

এতক্ষণ বলিতে ভুলিয়া গিয়াছি যে, যুবকের উচ্চারণে কিছু বৈশিষ্ট্য ছিল, তাহার মুখে যাবতীয় শ, ষ, স-এর উচ্চারণ 'S' বর্ণটির ধ্বনির মতো।

তোমাদের দেশের নাম কি?

গৌড়, সমতট, পৌণ্ড্রবর্ধন, আরও কত কি আছে।

এত নাম, তার মানে অনেক দেশ।

না সম্রাট, দেশ একটাই নাম ভিন্ন ভিন্ন।

আশ্চর্য! এমন কেন হল?

এমন না হওয়াই অস্বাভাবিক। জাতিবৈর আমাদের প্রধান লক্ষণ। এক স্থানের অধিবাসীদের মধ্যে কোন কারণে কলহ বেধে উঠ্‌লে যারা পরাজিত হয়, তারা দেশের অন্য এক অংশে এসে বসতি

স্থাপন করে, আর নূতন নামকরণ করে। এমনি ক'রে নিত্য-নূতন নামের সৃষ্টি হচ্ছে।

কলহ মীমাংসার জন্য দেশে অবশ্য রাজা আছেন।

অবশ্যই আছেন কিন্তু তার ফলে কলহ আরো বেড়ে চলে।

কেন?

কেউ কাউকে রাজগী ছেড়ে দিতে রাজি নয়। একবার তো মন্ত্রী হবার লোক খুঁজে পাওয়া যায় না।

কেন?

ঐ পদের দাবী নিয়ে অর্ধেক লোক মাথা ফাটাফাটি ক'রে মরেছে, বাকি অর্ধেক ভয়ে পালিয়েছে।

আশ্চর্য তোমাদের দেশ।

যা বলেছেন মাইরি। চলুন না একবার দেখে আসবেন।

যাবো বলেই তো প্রস্তুত হয়েছিলাম, কিন্তু এখন ভাবনা শুরু হয়ে গেল।

কেন?

সে কথা যথাসময়ে হবে। যুবক, তুমি এখন গ্রীক শিবিরে বন্দী রইলে, দুইজন প্রতিহারী থাকবে তোমার গৃহে।

দুইজন প্রতিহারীর বদলে একজন প্রতিহারিণী হয় না? শুনেছি গ্রীক রমণীরা বড় সুন্দরী।

যুবক বিদায় হইলে সেকেন্দার শা আদেশ প্রচার করিলেন যে, পুনরাজ্ঞা পর্যন্ত যুদ্ধযাত্রা বন্ধ রহিল। তারপরে তিনি চিন্তান্বিতভাবে নিজ শিবিরে প্রবেশ করিলেন।

৩

গ্রীক বাহিনীর মগধযাত্রা অনির্দিষ্ট কালের জন্য বন্ধ হইয়া গিয়াছে।

সেকেন্দার শা নিজ শিবিরে বসিয়া আছেন, পাশে তাঁহার সুরাসঙ্গিনী এক গ্রীক রমণী। রমণী সুন্দরী। সেকেন্দার শা তাহাকে আদর করিয়া ডাকেন 'হেলেন।' হেলেন পাণ্ডুলিপি পড়িতেছে, সেকেন্দার শা গম্ভীরভাবে শুনিতেছেন। হেলেন পড়িতেছে—"আমাদের পূর্বপুরুষ মহাভেটক বহু যুগ আগে বন্যাস্রোতে ভাসিতে ভাসিতে গৌড়-সমতটে আসিয়া আশ্রয় পান। সেই হইতে তিনি সেখানে বসবাস সুরু করেন। কালক্রমে সমস্ত দেশ তাঁহার বংশধরগণে ছাইয়া যায়। আমরা সকলেই সেই মহাভেটকের উত্তর পুরুষ। বিবর্তনের নিয়মানুসারে আমাদের গায়ের ভেড়ার চামড়া ক্রমে মানুষের চামড়ায় পরিণত হইলেও ভেড়ার চামড়ার সহিষ্ণুতা ও স্থূলতা প্রভৃতি গুণ আমাদের চরিত্রগত হইয়া রহিয়া গিয়াছে। এক সময় আমরা মহা-ভেটকের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে ভেড়ার চামড়া গায়ে দিয়া থাকিতাম, এখন আর তাহা করা হয় না সত্য, কিন্তু আমাদের বুদ্ধি এখনো ভেটকাশ্রিত। জম্বু দ্বীপের অন্যান্য জাতি সামান্য মনুষ্য হইতে উদ্ভূত, আমাদের উদ্ভব সেই পৌরাণিক ভেড়া হইতে, তাই আমাদের শ্রেষ্ঠত্ব। জম্বু-দ্বীপবাসিগণ আমাদের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার না করিলেও আমরা নিজেরাই নিজ মস্তকে শ্রেষ্ঠত্বের কিরীট অর্পণ করিয়াছি।"

এই পর্যন্ত পড়িয়া হেলেন হাসিয়া উঠিল, সুরাপাত্রের সঙ্গে সুরাপাত্রের আঘাত লাগিলে যেমন মদির চিক্কণ ধ্বনি ওঠে, তেমনি শব্দ তাহার হাসির।

সেকেন্দার শা মুখ তুলিয়া বলিলেন, হেলেন তোমার হাসি পাচ্ছে কিন্তু আমার অন্তরাত্মা শুকিয়ে উঠ্‌ছে।

কেন সম্রাট?

ভয়ে!

পৃথিবীজয়ী সেকেন্দার শার মুখে এ কথা নতুন বটে!

সত্যই নতুন, তাই বলে মিথ্যা নয়।

কেন?

কেন কি। ওদেশ মগধের পাশেই, মগধ জয় করলে ক্রমে ওদের সংস্পর্শে আসতে হ'তো, আর ওদের সংস্পর্শে কি দশা হ'তো বুঝতে পারছ কি?

কার দশা?

গ্রীক বাহিনীর, গ্রীক সভ্যতার, গ্রীক সংস্কৃতির।

কিছুই বুঝ্‌তে পারছি না।

ঐ একটি লোক এ ক'দিনে এখানকার গ্রীক শিবিরে একটা বিপর্যয় বাধিয়ে দিয়েছে। একটা লোকে যদি এমন করতে পারে তবে এক দেশ লোকের প্রভাবে গ্রীক সৈন্যরা কি বর্বর হয়ে উঠ্‌ত না? কোথায় থাকতো তাদের শিক্ষাদীক্ষা, সভ্যতা-ভব্যতা। তারা আবার গ্রীসে ফিরে গেলে সমস্ত গ্রীসের অবস্থা কী হ'তো একবার ভেবে দেখো।

হেলেন শুধাইল, সম্রাট কি ইতিমধ্যে লোকটির সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলেন?

করিনি! প্রতিদিন একবার ক'রে সাক্ষাৎ করেছি। যত তাকে দেখি, যত তার কথা শুনি তত বিস্ময় ও ভীতি বেড়ে চলে।

লোকটি বলে কি?

যা বলে তা একমাত্র মহাভেটকের উত্তর পুরুষের পক্ষেই সম্ভব।

লোকটা আছে কোথায় ?

তাকে পণ্ডিত ও মনস্তত্ত্ববিদগণের নজরবন্দীতে রেখেছি। তার কার্যকলাপ, কথাবার্তা, আচার ব্যবহার সমস্ত টুকে নেবার নির্দেশ দিয়েছি, প্রতিদিন সেই পাণ্ডুলিপি আমার কাছে পেশ করবার নিয়ম। ঐ যে এতক্ষণ মহাভেটক পুরাণ পড়লে সেই পাণ্ডুলিপিরই অংশ।

এমন সময়ে দ্রুতপদে এন্টিগোনাস শিবিরে প্রবেশ করিয়া সম্রাটকে অভিবাদন করিল।

কি সংবাদ এন্টিগোনাস ?

ঐ গৌড়দাস নামে লোকটিকে নিয়ে মুস্কিলে পড়া গিয়েছে।

আবার নূতন কি ঘটলো? সেদিন তো বলেছিলে যে, গ্রীক সৈন্যদের ইক্ষুচর্বণ করতে শেখাচ্ছে।

সেটা ইক্ষু চর্বণ নয়, সম্রাট, যদিচ প্রথমে তাই মনে হয়েছিল।

তবে সেটা কি ?

ঐ প্রথাকে নাকি গৌড়ে 'দন্তধাবন' বলে।

গাছ দিয়ে দাঁত ঘষা ? ওদের দাঁত খুব শক্ত বুঝতে হবে।

হেলেন বলিল, না হবার কারণ কি! ওরা যে মহাভেটকের বংশ।

এই বলিয়া সে হাসিয়া উঠিল। হেলেন কথায় কথায় হাসে, তাহার হাসি সম্রাটের বড় প্রিয়। কিন্তু আজ তার হাসি সেকেন্দার শা'কে আকর্ষণ করিতে পারিল না।

যাক্ এখন সে কি করছে বলো।

আমাদের সৈন্যদের গৌড়ীয় পরিচ্ছদ পরতে শেখাচ্ছে।

অসম্ভব।

গৌড়ে সকলই সম্ভব, সম্রাট।

এতো গ্রীকের মতো কথা নয়।

নয়ই তো। ওটা আমি তার কথারই প্রতিধ্বনি করলাম।

আর কি বলে সে।

বলে যে অনুকরণ-বিদ্যার বলেই গৌড় শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করেছে, বলে যে সব বিদ্যার সেরা অনুকরণ বিদ্যা, বলে যে গ্রীক সৈন্যগণ গৌড়ের অনুকরণ চর্চা করুক, দূর ভবিষ্যতে একদিন মহাভেটকের মন্ত্রশিষ্য বলে গৌরব লাভ করতে পারবে।

কি সর্বনাশ। গ্রীক সৈন্যগণের মনোভাব কি রকম?

তাদের মন টলমল করছে, বাধা না পেলে ঐদিকে গড়িয়ে পড়বে।

সেকেন্দার শা বলিয়া উঠিলেন, পিতা জিউস্, রক্ষা করো।

সম্রাটের অনুমতি যদি হয় তবে লোকটাকে নিকেশ করে দি।

তার চেয়ে লোকটাকে একবার নিয়ে এসো।

এন্টিগোনাস বিদায় হইবে এমন সময়ে অদূরস্থিত গ্রীক শিবির হইতে বিপুল সঙ্গীত ধ্বনি উঠিল।

সকলে উৎকর্ণ হইয়া উঠিল।

সেকেন্দার শা বলিলেন, এতো হোমারের মহাকাব্য নয়।

এন্টিগোনাস বলিল,—এতো পিণ্ডারের স্তব নয়।

হেলেন বলিল,—এতো সাফোর কাব্য নয়।

সকলে সমস্বরে বলিয়া উঠিল—তবে কি?

তখনই সকল সন্দেহভঞ্জন করিয়া গানের বাক্য স্পষ্টতর হইয়া উঠিল। সমস্ত গ্রীক বাহিনী ঐক্যতানে গাহিতেছে।

'কুড়বা কুড়বা কুড়বা লিজ্জে
কাঠায় কুড়বা কাঠায় লিজ্জে।'

হা পিতা জিউস বলিয়া দিগ্বিজয়ী সেকেন্দার শা বসিয়া পড়িলেন।

অন্যদের বাক্‌স্ফূর্তি হইল না।

তখন সেকেন্দার শা আত্মসংবরণ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন, অরাতিনিধন অসি হস্তে লইয়া বলিলেন, চলো দেখি এন্টিগোনাস একবার, দেখি কোথায় সেই নরাধম।

হেলেন মনে মনে বলিল,—ভেটকাধম।

সম্রাটকে অনুসরণ করিয়া এন্টিগোনাস সৈন্য শিবিরের দিকে চলিল।

৪

সম্রাটকে দেখিতে পাইয়া সৈন্যগণ গান থামাইল আর এমন ভাব ধারণ করিল যে, গৌড়দাসকে তাহারা কখনো চোখেও দেখে নাই। কিন্তু স্বয়ং গৌড়দাস তো গ্রীক নয়, সে নির্ভীক, সে কিছুমাত্র বিচলিত না হইয়া সানকি থালা বাজাইয়া চলিল—

'কাঠায় কাঠায় ধূল পরিমাণ
বিশ গণ্ডা হয় কাঠায় প্রমাণ।
গণ্ডা বাকি থাকে যদি কাঠা নিলে পর
ষোল দিয়ে পুরে তারে সারা গণ্ডা ধর।'

তাহার অভদ্রতা দর্শনে সেকেন্দার শা গর্জন করিয়া বলিলেন, বর্বর, তোমার মৃত্যুতে ভয় নাই?

গৌড়দাস বলিল,—

'ওহে মৃত্যু তুমি মোরে কি দেখাও ভয়?
ও ভয়ে কম্পিত নয় আমার হৃদয়।'

কেন বর্বর?

সম্রাট বীর আর নপুংসককে বধ করেন না।

কি ক'রে জানলে?

আগে খবর নিয়েছি মাইরি। গৌড়বাসীর বীরত্ব, মহত্ত্ব, বদান্যতা সমস্তর মূলে সূক্ষ্ম হিসেব থাকে।

তুমি আমার সৈন্যদের কুশিক্ষা দিচ্ছ কোন্ সাহসে?

কুশিক্ষা? প্রাণ জল ক'রে দিলে মাইরি। গৌড়ের ভাষা শিখবে, গৌড়ের গান করবে সেটা হল কিনা কুশিক্ষা? গৌড়বাসী যে পৃথিবীর সব জাতির সেরা।

গ্রীকদের চেয়েও?

নিশ্চয়।

কি প্রমাণ?

তোমরা গরু খাও, শূকর খাও।

আর তোমরা কি খাও?

ব্যাঙের ছাতা।

খাদ্য কি মনুষ্যত্ব নিরূপণের মাপকাঠি?

নয় কেন? খাদ্যসারই তো ক্রমে রক্ত মাংসে বুদ্ধিতে পরিণত হয়।

অদ্ভুত তোমার যুক্তি।

অদ্ভুত কিন্তু সত্য। দেখুন না কেন জম্বুদ্বীপের সব জাতির মধ্যে আমরা শ্রেষ্ঠ। কেন? ওরা সব ছাতু খায়, ড়হরকি ডাল খায়, ইয়া মোটা মোটা গেহুম কি চাপাটি খায়, কাঁচা শুপারী খায়, পানের সঙ্গে শুণ্ডী খায়, দহিবড়া খায়, রসন্ খায়, দোসা খায়, শ্রীখণ্ডি খায়, ইমলি খায়। তাই তারা সব হীন, ছোট, বোকা। আর আমরা গৌড়বাসীরা শ্রেষ্ঠ—কেন না আমরা খাই বিশুদ্ধ ব্যাঙের ছাতা আর—

আর কি?

পত্নীর পদাঘাত।

সম্রাট ছাড়া আর সকলে হাসিয়া উঠিল।

সম্রাট শুধাইলেন, কোনটা বেশি ভালো লাগে?

গৌড়দাস বলিল, এখানে আমার সেই সহধর্মিণী নেই তাই সত্য কথাই বলবো, ব্যাঙের ছাতাই কিছু বেশি মিষ্ট।

(মনে রাখিতে হইবে যুবকের মুখে শ, ষ, স = S)

তোমাদের শ্রেষ্ঠত্বের আর কোন প্রমাণ আছে?

কত চাই? অনুকরণপ্রিয়তা, পরশ্রীকাতরতা, আত্মকলহ, জাতিবৈর, পরজাতিবিদ্বেষ সমস্তই আমাদের শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ।

তোমরা যখন অন্য দেশে যাও সে দেশের লোকে তোমাদের মারে না!

মারে বই কি। সেটাও আমাদের শ্রেষ্ঠত্বের আর একটা প্রমাণ।

কেমন?

আমাদের শ্রেষ্ঠত্বে ঈর্ষাপরায়ণ বলেই তারা মারে।

তোমরা কি করো?

সভা করে প্রতিবাদ জানাই।

গ্রীক সৈন্যগণ তোমাদের দেশে গেলে তোমরা কি করবে?

পরাজয় স্বীকার করবো।

লড়াই করবে না?

আরে রামো, লড়াই করে তো অসভ্য বর্বররা। আমাদের পূর্ব পুরুষগণও কখনো লড়েনি, উত্তরপুরুষগণও কখনো লড়বে না।

উত্তরপুরুষের কথা জানলে কি প্রকারে?

মহাভেটক পুরাণের ভবিষ্যৎ খণ্ডে লেখা আছে কি না।

কি লেখা আছে?

ভবিষ্যৎকালে আমাদের দেশে, শ্বেত জাতি, পীত জাতি, রক্ত জাতি প্রভৃতি আসবে, বিনা রণে তারা দেশ অধিকার করবে।

আমরা তোমাদের দেশ অধিকার করলে তোমরা আমাদের সহ্য করবে ?

অবস্থা এমন ক'রে তুলবো যে তোমরা আমাদের সহ্য করতে না পেরে দেশ ছেড়ে পালাবার পথ খুঁজতে থাকবে।

তা কিরূপে সম্ভব বুঝিয়ে বলো।

গৌড়দাস সুরু করিল—বেশি বোঝাতে হবে না, দু'চার কথা শুনলেই মাথার ঘিলু চচ্চড় করতে থাকবে। তোমরা আমাদের দেশ জয় করবে, আমরা লড়াই করিনে কাজেই সহজেই তা পারবে, কিন্তু তারপর ?

তারপর ওখানে স্থাপন করবো এক গ্রীক উপনিবেশ, তারা রাখবে তোমাদের চির পদানত ক'রে। তোমরা কি করতে পারো।

কি করতে পারি শুনুন সম্রাট। যে গ্রীক সমাজ ওখানে থাকবে প্রথমে তারা ভুলবে তাদের ভাষা, ভুলবে তাদের কাব্য, ভুলবে তাদের ভাস্কর্য, ভুলবে স্থাপত্য, সঙ্গীত অন্যান্য সব শিল্পকলা। তারপরে তারা ভুলবে সভ্য আচরণ, সভ্য শিক্ষাদীক্ষা, সভ্য ব্যবহার। ক্রমে তারা নিজেদের মধ্যে এ ওকে মারবে কনুইয়ের গুঁতা, এ ওর পা দেবে মাড়িয়ে। এই কিছুক্ষণ আগে যে 'কুড়বা কুড়বা কুড়বা লিজ্জে' শুনে সম্রাটের মগজে আগুন জ্বলে উঠেছিল শেষে এমন অবস্থা হবে যে ঐ গান না শুনলে ওদের বুকে আগুন জ্বলে থাকতে থাকবে। আর চূড়ান্ত হবে তখনি ব্যাঙের ছাতা ছাড়া মুখে আর কিছু রুচবে না। এইভাবে বিজিত গৌড় হবে বিজয়ী।

তাহার মন্তব্য শুনিয়া গ্রীকগণ বলিয়া উঠিল—সর্বনাশ।

কেবল হেলেন বলিল, তোমাদের আর একটা প্রিয় খাদ্যের কথা তো বললে না।

কি খাদ্য প্রাণাধিক ?

স্ত্রীর পদাঘাত।

তার চেয়েও আর একটা প্রিয় খাদ্য আছে ?

কি ?

পরস্ত্রীর পদাঘাত।

কি যে বলো !

কি বিশ্বাস হ'ল না ? চলো না মাইরি, ঐ ঝোপটার আড়ালে ব'সে একটু গল্পগাছা করি।

মরি কি শখ !

এতেই মরি, মরি। তবু তো দেখছি এ দেশে পাটের চাষ নেই।

পাট কি ?

সে এক রকম ফসল। সেই পাট ক্ষেতের আড়ালে আমাদের দেশে যে-নারীর সঙ্গে গল্পগাছা হয় তাকে আমাদের দেশে কি বলে জানো ?

কি বলে ?

পাটরাণী।

ক্ষণিক বিস্ময় অন্তে সেকেন্দার শা বলিয়া উঠিলেন, বর্বর, ভদ্রতার সীমা অনেকক্ষণ লঙ্ঘন করেছিস। আজ রাত তুই বন্দী থাকবি, কাল তোর প্রাণদণ্ড হবে।

যুবক বলিয়া উঠিল, সম্রাট, আমাকে বধ করতে পারেন, কিন্তু তাতে কি লাভ হবে ? গৌড়ীয় স্বভাব কি ধ্বংস করতে পারবেন।

সেকেন্দার শা আর কোন বাদানুবাদ না করিয়া প্রস্থান করিলেন।

গৌড়দাস হেলেনকে উদ্দেশ করিয়া বলিল,—আয় না মাইরি একবার।

হেলেন প্রস্থানে উদ্যত হইলে গৌড়দাস হাত নাড়িয়া বলিল—

টা—টা

দেবো সোনার বাটা,

উঠছে না ওর পাটা

মিছামিছি হাঁটা

সৈন্যগণ তাহার ছড়া শেষ হইতে দিল না, তাহাকে টানিয়া লইয়া গেল। সে যাইতে যাইতে ঘাড় ফিরাইয়া দেখিল হেলেন তাহার দিকে তাকাইয়া আছে, অমনি পরমোৎসাহে সে আঙ্গুল কয়টা নাড়িয়া আবার বলিয়া উঠিল—টা-টা।

সারা রাত্রি বিনিদ্র থাকিয়া শেষ রাত্রে সেকেন্দার শার একটু ঘুম আসিয়াছিল। তিনি স্বপ্ন দেখিতেছিলেন যে, পরাজিত পারস্য সম্রাট দারীয়ুষ সসৈন্যে আড়াই লক্ষ ইঁদুরে পরিণত হইয়া সেকেন্দার শার মগজে ঢুকিবার চেষ্টা করিতেছে, মাথার খুলি খুঁড়িবার শব্দ উঠিতেছে কুড়, কুড়। ভীত সেকেন্দার শা লাফাইয়া জাগিয়া উঠিলেন। বুঝিলেন দুর্ঘটনা সত্য নয়, স্বপ্ন মাত্র! কিন্তু একি তবু কুড় কুড় শব্দ থামে না কেন? প্রকৃত ব্যাপার কি জানিবার আশায় শিবিরের দরজায় আসিয়া দাঁড়াইলেন—আর বুঝিলেন উহা ইঁদুরের শব্দ নয়, গৌড়দাস কর্তৃক শিক্ষিত সেই মহা গণসঙ্গীত—'কুড়বা কুড়বা কুড়বা লিজ্জে।'

প্রভাতী কুক্কুট রবের সঙ্গে মিশ্রিত হইয়া ঐ সঙ্গীত তালে তালে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হইতেছে—আর বিজয়ী গ্রীক সৈন্যগণ সেই সঙ্গীতের

সহিত তালে তালে পা ফেলিয়া সবেগে দন্তধাবন করিতে করিতে দলে দলে পুণ্যতোয়া শতদ্রু নদীতীরে চলিয়াছে।

এই সঙ্গীত শুনিয়া, এই দৃশ্য দেখিয়া ভুবনবিজয়ী সেকেন্দার শা কপাল চাপড়াইয়া বলিয়া উঠিলেন—পিতা জিউস, আমাকে রক্ষা করো, গ্রীক সভ্যতাকে রক্ষা করো।

তখন রাত্রের আর একটা দুঃস্বপ্নের স্মৃতি তাঁহার মনে পড়িল। অর্ধ জাগরণ ও তন্দ্রায় স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন যে, একটা অতিকায় ব্যাঙের ছাতা প্রসারিত হইয়া সমগ্র গ্রীস দেশকে ছায়াচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে। এখন তাঁহার মনে হইল, এ ব্যাঙের ছাতা আর কিছুই নয় গৌড়ীয় প্রভাব। তিনি ভাবিলেন এ কি সর্বনাশ করিতে উদ্যত হইয়াছেন, গৌড় জয় করিলে শেষ পর্যন্ত গৌড়েরই বিজয় হইবে, গ্রীক সভ্যতা ব্যাঙের ছাতায় আচ্ছন্ন হইয়া যাইবে। গ্রীক সভ্যতা প্রসারের মানসে তিনি দিগ্বিজয়ে বাহির হইয়াছিলেন, কিন্তু এখন বুঝিতে পারিলেন যে, তিমিকেও গিলিতে পারে এমন তিমিঙ্গিল সম্ভব। না, এ হইতেই পারে না, এভাবে গ্রীক সভ্যতা বিসর্জন দেওয়া কিছুতেই সম্ভব নয়। এরিস্টটলের শিষ্য, প্লেটোর প্রশিষ্য, সক্রেটিসের অতিপ্রশিষ্য এ ছাড়া আর কি ভাবিবেন? তিনি স্থির করিলেন যে, দিগ্বিজয় মাথায় থাকুক, এখন ভালোয় ভালোয় দেশে ফিরিতে পারিলে বাঁচা যায়।

এমন সময় একজন প্রতিহারী প্রবেশ করিয়া অভিবাদনান্তে একখানি পত্র তাঁহার হাতে দিল। তিনি পত্র খুলিয়া দেখিলেন হেলেনের হস্তাক্ষর। পত্র পড়িয়া ভয়ে বিস্ময়ে পরিতাপে স্তম্ভিত হইয়া তিনি বসিয়া রহিলেন। ঠিক সেই সময়ে সেলুকাস প্রবেশ করিল। সম্রাটকে তদবস্থায় দেখিয়া সে বলিল, সম্রাটকে বিমর্ষ দেখছি কেন?

সেকেন্দার শা বলিলেন—পত্রখানা প'ড়ে দেখো।

সেলুকাস পত্র পড়িল,

হেলেন লিখিতেছে—

সম্রাট্,

কৌশলে বন্দীকে উদ্ধার ক'রে নিয়ে পাটরাণী হ'বার আশায় দু'জনে প্রস্থান করলাম। আমার সন্ধান করবেন না, করলেও পাবেন না, পেলেও আমি আর ফিরবো না, কারণ বন্দীই আমার প্রাণেশ্বর।

সম্রাট্, অনেকদিন আপনার কাছে ছিলাম, অনেক দয়া, অনেক অর্থ পেয়েছি। বিদায়কালে আপনার মঙ্গল কামনায় একটি মিনতি জানিয়ে যাই, সুরাপানের পরিমাণ কমিয়ে দেবেন। ঐটি আপনার প্রধান দোষ। আমার মাথা খান অনুরোধটি রাখবেন।

ইতি—

গৌড়াভিমুখিনী

হেলেন।

পুঃ—সম্ভব হলে কিছু উৎকৃষ্ট গৌড়ীয় ব্যাঙের ছাতা আপনার ভোগের উদ্দেশ্যে পাঠিয়ে দেবার চেষ্টা করবো।

সেলুকাসের পত্র পাঠ শেষ হইলে সেকেন্দার শা শুধাইলেন, কি বোঝো সেলুকাস।

সেলুকাস বলিল, হেলেনের মতো গ্রীক সভ্যতার ক্ষীরপুতুলির যেখানে এরূপ মতিগতি—অন্যে পরে কা কথা। সম্রাট আমি কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ়।

সম্রাট বলিলেন—আমি কর্তব্য স্থির করে ফেলেছি।

কি কর্তব্য সম্রাট?

এসো তাঁবুর বাইরে এসো।

দু'জনে বাহিরে আসিলে সম্রাট বাদকগণকে ঘোষণাধ্বনি করিতে

আদেশ দিলেন। মুহূর্তে শত শত তূরী, ভেরী গগনভেদী বৃংহিত করিয়া উঠিল। দেখিতে দেখিতে পদাতিক, অশ্বারোহী উচ্চনীচ যাবতীয় গ্রীক-সৈন্য সম্রাট সমীপে ব্যূহবদ্ধ হইয়া আদেশের প্রতীক্ষায় দাঁড়াইল।

বাদ্যোদম শান্ত হইলে সেকেন্দার শা কম্বুকণ্ঠে আদেশ করিলেন—জাল গুটাও, অর্থাৎ শিবির তোলো। এখনি যাত্রা করতে হবে।

এন্টিগোনাস প্রত্যাশাভরে শুধাইল, পূর্ব দিকে?

না, পশ্চিম দিকে, জন্মভূমি গ্রীসের দিকে। আর এক মুহূর্ত বিলম্ব নয়। যে যে-ভাবে আছ, এখনি যাত্রা করো।

সকলে সমস্বরে বলিয়া উঠিল হেলাস, হেলাস অর্থাৎ গ্রীস্ গ্রীস্।

সম্রাটের হঠাৎ মতি পরিবর্তনের কারণ কেহ বুঝিল না। কিন্তু সম্রাটের আদেশ অলঙ্ঘ্য, কাজেই গ্রীকবাহিনী তখনই পশ্চিম মুখে গ্রীসের দিকে যাত্রা আরম্ভ করিয়া দিল।

ইহাই পেস্কাডস্ লিখিত সেকেন্দার শা-র অকস্মাৎ ভারত ত্যাগের প্রকৃত বিবরণ।

সেই সন্ন্যাসীটির কি হইল

১

রাজপুত্র সিদ্ধার্থ কোন্ অভিজ্ঞতার পরিণামে সংসার ত্যাগ করিয়াছিলেন, তাহা নিতান্ত বালকেও জানে। রাজকীয় সুখ ও ঐশ্বর্যে লালিত-পালিত যুবক রাজপুত্র নগর ভ্রমণে বাহির হইয়া পর পর চারদিন চারটি দৃশ্য দেখিলেন, মৃতদেহ, রুগ্‌ণ, জরাগ্রস্ত ব্যক্তি ও একজন সন্ন্যাসী। প্রথম তিনটি দৃশ্য দেখিয়া বুঝিলেন যে, মানুষ যতই আরামে বিলাসে মগ্ন থাকুক না কেন, মৃত্যু, ব্যাধি ও জরা তাহার অবশ্যম্ভাবী পরিণাম, ইহাদের আক্রমণ এড়াইবার কোন উপায় কোন দেহীর নাই। চতুর্থ দিনে তিনি দেখিলেন চীরাজিনধারী এক প্রফুল্ল সন্ন্যাসী। তখন তাঁহার মনে হইল সন্ন্যাসের পথ গ্রহণ করিলে হয়তো বা জরা ও ব্যাধির কবল হইতে রক্ষা পাওয়া সম্ভব, মৃত্যুর কবল অবশ্য অনপনেয়, কিন্তু যাহার বাসনার মূল ছিন্ন হইয়াছে, মৃত্যুতে তাহার আবার ভয় কি? তখন তিনি সঙ্কল্প করিলেন যে, আর বিলম্ব নয়, সেই রাত্রেই সংসার পরিত্যাগ করিবেন ও দূরবর্ত্তী কোন স্থানে গিয়া তপস্যায় মনোনিবেশ করিবেন। এ পর্যন্ত সকলেরই পরিজ্ঞাত, পরে রাজপুত্র সিদ্ধার্থ কিভাবে তথাগত বুদ্ধরূপে জগতের অন্যতম ধর্মগুরুতে পরিণত হইলেন, তাহাও কাহারো অবিদিত নহে।

আমি আজ অন্য বিষয় বলিতে বসিয়াছি, আর খুব সম্ভব সে বিষয়টি তত সুপরিজ্ঞাত নহে। সেই সন্ন্যাসীটিকে দেখিয়া রাজপুত্র সিদ্ধার্থের মনে যে ভাব বিপর্যয় ঘটিল তাহা সকলে জানে বটে, কিন্তু রাজপুত্র

সিদ্ধার্থকে দেখিয়া সেই সন্ন্যাসীটির মনে কি ভাবোদয় ঘটিয়াছিল, তাহা কি কেহ ভাবিয়া দেখিয়াছে ? যতদূর জানি, বিষয়টি লইয়া কেহ চিন্তা করে নাই, এমন কি ইহাতে চিন্তনীয় যে কিছু থাকিতে পারে, তাহাও কেহ ভাবিয়া দেখে নাই। রাজপুত্র সিদ্ধার্থ সন্দর্শনে সেই সন্ন্যাসীর চিন্তা বিপর্যয় ও তাহার পরবর্তী জীবনকাহিনীই আজ আমার আলোচ্য বস্তু।

২

সেই সন্ন্যাসীটি তীর্থ ভ্রমণে বাহির হইয়া কপিলাবস্তু নগরে আসিয়া পৌঁছিলেন এবং সেদিন প্রাতঃকালে ভিক্ষার্থ রাজপথে বাহির হইলেন। আগের তিন চারদিন তাঁহাকে বনপথ অতিক্রম করিতে হইয়াছে, খাদ্য কিছু মেলে নাই, কাজেই ক্ষুধায় তাঁহার দেহ ক্লান্ত ও মন বিরক্ত হইয়াছিল। ক্ষুধাতৃষ্ণা সন্ন্যাসীর দেহ মন যে বিকল করে, গৃহীরা এ সত্য স্বীকার না করিলেও প্রকৃত সন্ন্যাসিগণ তাহা কখনো গোপন করে না। ভিক্ষায় বাহির হইয়া তিনি দেখিলেন যে, সম্মুখে একটি আড়ম্বরপূর্ণ শোভাযাত্রা। নাগরিকগণ সেই শোভাযাত্রা দেখিতে ব্যস্ত, কেহ সন্ন্যাসীকে বড় লক্ষ্য করিল না, লক্ষ্য না করিলে আর ভিক্ষা মিলিবে কি প্রকারে ?

সন্ন্যাসী ভাবিলেন ভালই হইল, ঐ শোভাযাত্রার দিকেই যাওয়া যাক, দু'চার মুষ্টি তণ্ডুল বা দু' চারিটি কার্যাপণ পাওয়া অসম্ভব হইবে না। ইতিমধ্যে তূরী ভেরী জগঝম্প বাজাইয়া, রথ অশ্ব হস্তী পদাতিক সমাভিব্যাহারে শোভাযাত্রা কাছে আসিয়া পড়িল, তাঁহাকে আর বেশি অগ্রসর হইতে হইল না। সন্ন্যাসী দেখিতে পাইলেন, সেই শোভা-

যাত্রার কেন্দ্রে একখানি সুবর্ণমণ্ডিত রথের উপরে সুখাসনে এক নধর-কান্তি সুপুরুষ যুবক উপবিষ্ট। যুবতী কিঙ্করীগণ কেহ চামর ঢুলাইতেছে, কেহ ময়ূরপাখার ব্যজন করিতেছে, কেহ তাম্বুল পানীয় অগ্রসর করিয়া দিতেছে; আর কয়েকজন সুবেশা সুন্দরী সেই রথের উপরেই তাহাকে ঘিরিয়া নৃত্য করিতেছে। শোভাযাত্রার একজনকে জিজ্ঞাসা করিয়া সন্ন্যাসী জানিলেন যে, তিনি নগরের যুবরাজ। সন্ন্যাসী তখন রথের দিকে অগ্রসর হইলেন; সন্ন্যাসী দেখিয়া সকলে পথ ছাড়িয়া দিল। সন্ন্যাসী রথের কাছে পৌঁছিয়া বলিলেন, যুবরাজ আপনার কল্যাণ হোক। সন্ন্যাসীকে কিঞ্চিৎ ভিক্ষা দান করুন।

এখন ইতিপূর্বে যুবরাজ কখনো ভিক্ষা শব্দটি শোনেন নাই, কাজেই ব্যাপারটা কি জানিতেন না। তিনি সারথিকে শুধাইলেন, লোকটি কি বলে? ভিক্ষার অর্থ কি?

এদিকে সারথির উপরে রাজার কড়া হুকুম ছিল যে, সংসারে দুঃখ দারিদ্র্য অভাব অনটন আধিব্যাধি যে আছে, পথের বাহির হইয়া যুবরাজ তাহা যেন না জানিতে পারেন।

তাই সারথি বলিল, যুবরাজ, ভিক্ষা মানে দান। ঐ ব্যক্তি আপনাকে দান করিতে চায়।

যুবরাজ শুধাইলেন, তবে ভাষাটা ও রূপ কেন?

সারথি বলিল, সন্ন্যাসীদের ভাষা স্বতন্ত্র।

ইত্যবসরে রাজপুরুষগণের ইঙ্গিতে শাস্ত্রী মন্ত্রিগণ সন্ন্যাসীকে ঠেলিয়া দূরে সরাইয়া দিল। জনতার কেহ কেহ বলিল, যাও, যাও, ঠাকুর আজকার আমোদটা মাটি করো না। কেহ বলিল, সকাল বেলাতেই তোমার মুখ দেখলাম. না জানি দিনটা কেমন যাবে!

সন্ন্যাসী পথের ধারে হাঁ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন আর শোভা-

যাত্রা তূরী ভেরী জগঝম্প বাজাইয়া নগর পরিক্রমায় অগ্রসর হইল। এই ঘটনায় সন্ন্যাসী ভিক্ষা পাইলেন না বটে, তবু প্রচুর শিক্ষা পাইলেন।

উৎসবমত্ত নগরী সেদিন সন্ন্যাসীকে ভিক্ষা দিতে ভুলিয়া গেল। অভুক্ত সন্ন্যাসী সন্ধ্যাবেলায় অবসন্ন দেহে নগরপ্রান্তের এক বৃক্ষতলে শুইয়া শুইয়া ভাবিতে লাগিলেন—হা ভগবান্ আমি কি মূর্খ। আজ বারো বছর, স্ত্রী পুত্র সংসার ও রাজত্ব ছাড়িয়া কোথায় ভগবান, ধর্ম কি, পরকাল কি, আত্মা আছে কিনা প্রভৃতি অবান্তর বিষয় চিন্তা করিয়া মাঠে ঘাটে বনে বাদাড়ে ঘুরিয়া মরিতেছি। কোন দিন ভিক্ষামুষ্টি জোটে, কোনদিন বা জোটে না ; কোনদিন আশ্রয় মানুষের গোয়াল, কোনদিন বা বৃক্ষতল ; রৌদ্র বৃষ্টি, শীত গ্রীষ্ম, মশক মক্ষিকা, শ্বাপদ দ্বিপদ, পরিশ্রম চিন্তা, ধ্যান ধারণা সমস্ত মিলিয়া স্বাস্থ্য ও যৌবন নাশ করিল, জীবনও শেষ হইবার মতো। অথচ কি ফলশ্রুতি? কিছুই না। ভগবান্ থাকিলে অবশ্যই এতদিনে দেখা মিলিত, যাহা নাই তাহার দেখা মিলিবে কিরূপে? হায়, হায়, আমি কি মূর্খ।

তারপরে সন্ন্যাসী ভাবিতে লাগিলেন, আর ঐ রাজপুত্রটি কি আরামে আছে দধি দুগ্ধ নবনী প্রভৃতির সম্মিলিত সহযোগিতায় উহার দেহটি কি ললিত কোমল। মুখ হইতে কথা বাহির হইবার আগেই মানুষের যা কিছু কাম্য মিলিতেছে। দেখো দেখি মশামাছি নাই তবু ব্যজন চলিতেছে, চর্বণরত মুখ বিশ্রাম পাইবার আগেই নূতন তাম্বুল জুটিতেছে, আর রথের উপরে যাহার এতগুলি সুন্দরী তরুণী গৃহে না জানি তাহার আরো কত! আহা, এই তো জীবন।

তারপর তিনি ভাবিলেন, হায় আমারও তো সব ছিল, সুন্দরী পত্নী রত্না, বালকপুত্র মাধব, কিঙ্কর, কিঙ্করী, রথ, অশ্ব, মন্ত্রী, শাস্ত্রী কিনা

ছিল। আর আজ কিনা এই অবস্থা। শাস্ত্র, মুনি, ঋষি ও আধুনিক অকালপক্কদের ধাপ্পায় পড়িয়া আজ হা ঘরে' হা ভাতে,' হা পত্নীক, হা পুত্রক হইয়া হায় হায় করিয়া ঘুরিয়া মরিতেছি।

তারপর ভাবিলেন, ভাগ্যে ঐ রাজপুত্রকে দেখিলাম, জানিলাম, জীবন কি, বুঝিলাম কত বড় ভুল করিয়াছি, কিন্তু আর নয়।

তখন তিনি স্থির করিলেন যে, গতস্য শোচনা নাস্তি, যা হইবার হইয়া গিয়াছে এখনো জীবনপাত্রে কিছু রস থাকা অসম্ভব নয়, তলানি-টুকুই অনেক সময়ে মধুরতর হয় শেষ চুমুকে তাহা পান করিয়া লইতে হইবে। পরদিন প্রাতঃকালেই চীরাজিন ত্যাগ করিয়া পুনরায় গৃহিবেশ ধারণ করিবেন, তিনি সঙ্কল্প করিলেন। এই সুখকর চিন্তা মনোমধ্যে উদিত হইবামাত্র তাঁহার চোখ ঘুমে ঢুলিয়া আসিল। তিনি চীর ও অজিন পাশে খুলিয়া রাখিয়া অনেকদিন পরে আরামে ঘুমাইলেন। সংসারের চিন্তাতেই এত সুখ। আহা সংসার কি মধুময়!

গভীর রাত্রে সেখানে এক ব্যক্তি আসিয়া দাঁড়াইল তাহার দেহে রাজবেশ। সম্মুখে অভাবিতভাবে চীর ও অজিন দেখিতে পাইয়া লোকটি সাগ্রহে তাহা তুলিয়া লইল। তারপরে রাজবেশ খুলিয়া সেখানে রাখিয়া নিজ দেহে চীরাজিন ধারণ করিল। লোকটি মনে মনে ভাবিল, অদৃষ্ট অবশ্যই সন্ন্যাসের ইঙ্গিত করিতেছে নতুবা এমনভাবে সন্ন্যাসীর যোগ্য বসন জুটিয়া যাইবে কেন? লোকটি তখন ধীর পদে অরণ্যের দিকে প্রস্থান করিল।

পরদিন প্রাতঃকালে সন্ন্যাসী জাগিয়া উঠিয়া বিস্মিত হইলেন এ কি চীরাজিন গেল কোথায়? তাহার স্থানে রাজবেশ আসিল কিরূপে? তখন তিনি বুঝিলেন ইহাই অদৃষ্টের ইঙ্গিত। বারো বৎসরব্যাপী সন্ন্যাসের অভিজ্ঞতায় সহজেই তিনি বুঝিলেন যে, সংসারে প্রত্যাবর্তনই

তাঁহার কর্তব্য, তাই সর্বজ্ঞ অদৃষ্ট মন্ত্রবলে চীরাজিন অপসারিত করিয়া তৎস্থলে রাজবেশ সন্নিবেশিত করিয়াছে। তাঁহার মৌলিক সঙ্কল্পের সহিত অদৃষ্টের এইরূপ সহযোগিতা দেখিয়া তিনি অত্যন্ত আশ্বস্ত হইলেন, আর সানন্দে রাজবেশ ধারণ করিয়া স্বীয় রাজ্যের দিকে দ্রুত-পদে যাত্রা করিলেন।

৩

পূর্বোক্ত ঘটনার পর আরও বারো বৎসর অতিবাহিত হইয়াছে

সেই সন্ন্যাসীটি পূর্বনাম অভিজ্ঞানবর্ধন নামে এতদিন রাজত্ব করিতেছিলেন। এই সময়ে একদা গভীর রাত্রে পুনরায় চীরাজিন অবলম্বন করিয়া তিনি গোপনে রাজধানী পরিত্যাগ করিলেন। রাত্রিতেই তিনি অনেক যোজন পথ অতিক্রম করিলেন। পরদিন এক বনের মধ্যে প্রবেশ করিয়া তিনি দেখিতে পাইলেন যে, একটি পুষ্পিত শালবৃক্ষের তলে দিব্যকান্তি এক সন্ন্যাসী ধ্যানমগ্ন। সন্ন্যাসীর ধ্যান-ভঙ্গের প্রত্যাশায় রাজা অভিজ্ঞানবর্ধন, যাঁহাকে এখন পুনরায় সেই সন্ন্যাসী বলা চলিতে পারে তিনি অপেক্ষা করিয়া রহিলেন। কয়েকদণ্ড পরে সন্ন্যাসীর ধ্যানভঙ্গ হইল। তখন সেই সন্ন্যাসী বর্তমান সন্ন্যাসীর পদপ্রান্তে প্রণাম করিয়া বলিলেন, প্রভু আমাকে দীক্ষা দিন।

তখন বর্তমান সন্ন্যাসী তাঁহাকে আশীর্বাদ করিয়া বলিলেন, বৎস, সন্ন্যাস বড় কঠিন, ও পথ সকলের জন্য নয়, কাজেই তুমি গৃহে ফিরে যাও।

ইহা শুনিয়া সেই সন্ন্যাসী বলিলেন, প্রভু, আপনার কথা সত্য। এক সময়ে আমি সন্ন্যাসী ছিলাম, কিন্তু পথটা যে পুষ্পাস্তীর্ণ নয়, বুঝতে পেরে পুনরায় সংসারে ফিরে গেলাম। তখন বুঝলাম যে, সংসারের পথটাও দুর্গম।

তোমার কথা মিথ্যা নয়, কিন্তু দু'য়ে তুলনা করলে বুঝবে সংসারটাই সহজসাধ্য।

দুয়ের তুলনা আমার চেয়ে বেশি কেউ করেনি, কাজেই আমার কথা আপনি বিশ্বাস করুন সংসারের পথ ক্ষুরধারের মত দুর্গম।

বিশ্বাস করা কঠিন। যাই হোক তোমার অভিজ্ঞতা শুনি, আমার জ্ঞান বৃদ্ধি হতে পারে।

'সেই কথাই ভালো' বলিয়া সেই সন্ন্যাসী পূর্বনাম অভিজ্ঞান বর্ধন আরম্ভ করিলেন—

সন্ন্যাসী হয়ে বেশ সুখেই ছিলাম, মাঝে মাঝে অভুক্ত বা অনিদ্র থাকতে হতো সত্য, কিন্তু এখন বুঝছি সংসারধর্ম পালনের চেয়ে তা অনেক ভালো। তারপর এক দিনের এক আকস্মিক অভিজ্ঞতায় আমার সর্বনাশ হ'ল। চীরাজিন ত্যাগ করে আমার রাজধানীতে ফিরে গেলাম।

তুমি কি রাজা ছিলে?

হা' প্রভু, পূর্বজন্মে অনেক দুষ্কৃতি না থাকলে কেউ রাজা হয় না।

তাঁহার কথা শুনিয়া বর্তমান সন্ন্যাসী হাসিলেন, বলিলেন, আচ্ছা বলো।

সেই সন্ন্যাসী পুনরায় আরম্ভ করিলেন—আমি ভেবেছিলাম আমি ফিরে যাওয়ামাত্র পত্নী, পুত্র, রাজপুরুষগণ ও প্রজাবৃন্দ সানন্দে আমাকে গ্রহণ করবে। কিন্তু কার্যত ঠিক তার বিপরীত ঘটল। বারো বছর আগে রাজধানী ছেড়ে ছিলাম। তার অল্প কয়েকদিন পরেই আমার

সাধ্বী স্ত্রী পুনরায় বিয়ে করে ফেলেছিলেন। অবশ্য সে স্বামী মৃত হওয়ায় সমস্যা অনেকটা সরল হয়েছিল। যদিচ আমার বিশ্বাস লোকটা মরেনি, সাধ্বী স্ত্রীর বিড়ম্বনায় সন্ন্যাসী বেশে দেশান্তরী হয়েছে। সে যাই হোক, দুই স্বামীর সাধ্বী স্ত্রী তৃতীয়বার পতিগ্রহণের উদ্যোগ যখন করছেন তখন আমার অপ্রত্যাশিত অশুভ আবির্ভাব। প্রভু আপনি সন্ন্যাসী হলেও নিশ্চয় বুঝতে পারছেন ব্যাপারটা কোন সাধ্বী পত্নীরই ভালো লাগতে পারে না। তিনি সরাসরি আমাকে অস্বীকার করে বসলেন, বললেন, ও আমার স্বামী নয়, কোন প্রবঞ্চক হবে। বুঝুন ব্যাপার একবার। এতদিন সন্ন্যাসী অবস্থাতেও এই স্ত্রীর জন্যই আমার বুক ফেটে যাচ্ছিল।

তার পরে?

ওদিকে আমার মন্ত্রীমশায় তার কন্যার সঙ্গে আমার পুত্রের বিবাহ দেবার সঙ্কল্প করেছে। সে জানে আর দুই বছর পরেই বয়ঃপ্রাপ্ত হয়ে যুবরাজ মাধব হবে রাজা, আর নিজে হবে রাজশ্বশুর, ক্ষেত্রবিশেষে রাজশ্বশুর মানেই রাজা। কাজেই মন্ত্রী আমাকে দেখে বলল, হাঁ, কতকটা মহারাজার মতো দেখতে বটে, তবে লোকটা আমাদের মহারাজা নয়। ওদিকে আমার পুত্র মাধব, যাকে পাঁচ বছরের রেখে সংসার ত্যাগ করেছিলাম, এখন সে সতেরো বছরের উঠ্‌তি যুবক, সেই মাধব মনে মনে স্থির ক'রে রেখেছে মন্ত্রী সহায় না থাকলে সিংহাসনে বসা কঠিন হবে, কারণ স্নেহময়ী জননীর কাছে তৃতীয় পতি-উমেদার যাতায়াত শুরু করছে। মাধব স্থির ক'রে ফেলেছে সিংহাসনে বসবামাত্র মন্ত্রী-কন্যাকে অর্থাৎ রাণীকে গুম্ খুন ক'রে পাঠশালার এক ভূতপূর্ব সহপাঠিনীকে বিবাহ করবে। এমন সময়ে আমার প্রত্যাবর্তন। সে বুঝলো তার যাবতীয় পরিকল্পনা অকালে শুকিয়ে গেল।

আর তোমার প্রজাবৃন্দের অসন্তোষের কি কারণ ?

আমার স্ত্রী মন্ত্রীর দুরভিসন্ধি বুঝ্‌তে পেরে প্রজাদের স্বপক্ষে রাখবার আশায় যাবতীয় রাজকর মকুব ঘোষণা ক'রে বসে আছেন, হেনকালে প্রকৃত মালিকের প্রত্যাগমন প্রজাদের পক্ষে কখনোই বাঞ্ছনীয় হতে পারে না। তারা বিদ্রোহ করে আর কি।

সত্যই তোমার কঠিন পরীক্ষা গিয়েছে। এ অবস্থায় সিংহাসনে বস্‌লে কি ক'রে ?

সে এক আশ্চর্য ঘটনা প্রভু। রাজপুরীর কেলি সরোবরে আমার পোষা আর বড় প্রিয় একটি সারস পাখী ছিল। সেটা কি রকম ক'রে আমার আগমন জানতে পেরেছে, সেটা তখন এক অদ্ভুত কাণ্ড ক'রে বস্‌লো। রাজপ্রাসাদের অভ্যন্তর থেকে ঠোঁটে ক'রে রাজমুকুট এনে আমার মাথায় পরিয়ে দিল।

বর্তমান সন্ন্যাসী বলিলেন,ঐ সারসটা পূর্বজন্মে তোমার পিতামহ ছিল।

সে কি প্রভু এটা যে সারসী।

তা হোক, জন্মান্তরে লিঙ্গান্তর ঘটা অসম্ভব নয়। আচ্ছা, তারপরে কি হল বলো।

এই অলৌকিক দৃশ্য দেখে সৈন্যদল হর্ষধ্বনি করে উঠ্‌ল, বলে উঠ্‌ল জয় মহারাজের জয়।

তাহলে বলো তোমার প্রতি সৈন্যদলের অনুরক্তি অটুট ছিল।

তা নয়, প্রভু, এতকাল রাজ্যে যুদ্ধ বা যুদ্ধ-সম্ভাবনা ছিল না, তাই সৈন্যদল ছিল অবহেলিত আর অপ্রাপ্তবেতন। এখন আমার অতর্কিত আগমনে, আমাতে মন্ত্রীতে রাণীতে যুবরাজে একটা যুদ্ধ-অশান্তি ঘটবার সম্ভাবনায় সৈন্যদল উৎফুল্ল হয়ে উঠল। তারা জানে যুদ্ধ আসন্ন হলে তবে বেতন পাওয়া যায়।

তারপর ?

তারপর আর কি! তিমিঙ্গিল উপস্থিত হলে বিবদমান তিমিগুলোর মধ্যে সহযোগিতা ঘটে। তখন রাণী, মন্ত্রী, যুবরাজ পরস্পর প্রতিযোগিতা ছেড়ে চৌরমৈত্রীতে বদ্ধ হল, আর আমাকে নাশ করবার ষড়যন্ত্র করলো।

যখন তারা দেখলো যে, সৈন্যদল আমার পক্ষে, তখন তারা এসে বল্‌ল, সবাই যে ঠিক এক কথা বল্‌ল, তা নয়, তবে ভাবটা অভিন্ন।

রাণী বল্‌ল, প্রাণাধিক, এতদিন অধীনীকে ভুলে কোথা ছিলে ?

আর অধিক সে বল্‌তে পারলো না, মূর্ছিত হয়ে পড়লো।

পুত্র বল্‌ল, পিতা আজ আবার আমি জীবন পেলাম।

মন্ত্রী বলল, মহারাজ, আপনি ফিরে এসেছেন, এবারে আমি স্বস্তিতে মরতে পারবো।

তারা সকলে একযোগে বলল, মহারাজ, আগামীকল্য নগর চত্বরে আপনার সম্বর্ধনা হবে, তাতে সবাই জানতে পারবে যে, আপনার শুভাগমন হয়েছে আর প্রজারাও চায় যে, একটা উৎসব হোক।

আমি বল্‌লাম ক্ষতি কি!

পরদিন সকলের সঙ্গে নগরচত্বরে উপস্থিত হয়ে দেখি, সুসজ্জিত সভাস্থল, মাঝখানে আমার জন্য স্বর্ণরৌপ্য খচিত আসন, চারিদিকে লোকারণ্য।

আমি আসনে বসতে যাবো, এমন সময়ে কোথা থেকে সেই সারসটি, আপনার কথা সত্য হলে আমার পূর্বজন্মের পিতামহ আমার প্রাণ রক্ষা করলো।

কি ভাবে ?

সারস ঠোঁট দিয়ে একটানে আসনখানা সরিয়ে দিতেই প্রকাশ পেলো অতলস্পর্শ গহ্বর।

হঠাৎ সেই সন্ন্যাসী গর্জন করিয়া উঠিল—ওরে নরাধম, এই অভিসন্ধি ছিল।

না, না প্রভু আপনাকে নয়, এই কথাগুলো তখন তাদের উদ্দেশ্যে বলেছিলাম।

তারপরে কি করেছিলে?

তখন রাণী, যুবরাজ ও মন্ত্রীকে সেই গর্তে নিক্ষেপ করে হেঁটে কাঁটা, উপরে কাঁটা দিয়ে সমাধিস্থ করলাম। অপ্রত্যাশিত আনন্দদায়ক দৃশ্য দেখে সমবেত জনগণ গর্জন করে উঠল জয় মহারাজের জয়।

তারপরে?

তারপরে বারো বছর রাজত্ব করলাম।

তবে এখন রাজ্য পরিত্যাগের বাসনা কেন?

এতদিনে সেই সারসটি মারা গিয়েছে, আর অরক্ষিতভাবে সংসারে থাকবার সাহস বা ভরসা নেই।

এই পর্যন্ত বলিয়া সেই সন্ন্যাসী করজোড়ে সানুনয়ে বলিল, প্রভু সমস্ত অকপটে বললাম,এবার আপনি আমাকে সন্ন্যাসে দীক্ষিত করুন।

তার আগে আমার সন্ন্যাসের পরীক্ষা শ্রবণ করো,পরে মনঃস্থির করো।

অতঃপর বর্তমান সন্ন্যাসী সন্ন্যাসজীবনের যাবতীয় দুঃখ বিবৃত করিলেন। স্ত্রী-পুত্র, পিতামাতা পরিত্যাগের দুঃখ, দেশে দেশে গুরুর অনুসন্ধান, ভণ্ড গুরুর সাক্ষাৎ, তপস্যার কঠোরতা প্রভৃতি কথা বলিলেন। তপস্যাকালে বিভীষিকা দর্শন, মার বা মদনের ছলাকলা প্রদর্শন, দেবগণের বরদানের জন্য আগমন, পিতামাতার ছদ্মবেশে কান্নাকাটি, এ সমস্তই তপস্যা নষ্ট করিবার উদ্দেশ্যে। কত না বিপত্তি, প্রলোভন তাঁহাকে অতিক্রম করিতে হইয়াছে। ক্রমে তপস্যার কৃচ্ছ্রতায় তাঁহার দেহ অস্থিচর্মসার হইল তাহাও কম দুঃখের নয়। অবশেষে

একদিন তাঁহার বোধি জন্মিল, তিনি বুঝিলেন যে, তপস্যার কঠোরতা কিছু নয়, আবার বিলাসময় জীবনও কিছু নয়, এ দুয়ের মধ্যবর্তী পথটাই জীবন সার্থকতার পথ। তখন তিনি এক পল্লী-বালিকা প্রদত্ত পরমান্ন ভোজন করিয়া বোধিমার্গে অগ্রসর হইলেন।

এই কাহিনী বলিয়া বর্তমান সন্ন্যাসী মন্তব্য করিলেন, বৎস, সংসারের অবিচারে তুমি সংসার ত্যাগে উৎসুক, কিন্তু দেখো সন্ন্যাসের পথও বড় সুগম নয়।

তা নয় জানি কিন্তু একবার পরীক্ষা করতে ক্ষতি কি।

একবার তো পরীক্ষা করেছিলে, তবে আবার সংসারে ফিরলে কেন?

সে এক বিচিত্র অভিজ্ঞতা। সন্ন্যাসিজীবনে এক রাজপুত্রের আরাম আয়াস দেখে হঠাৎ মতি পরিবর্তন ঘটল, সংসারাশ্রমে ফিরে গেলাম। আপনি হাসলেন কেন?

আমার জীবনেও অনুরূপ এক অভিজ্ঞতা ঘটেছিল। এক সন্ন্যাসীর দিব্য প্রশান্ত মুখচ্ছবি দর্শনে আমি সংসার ত্যাগ করতে মনস্থ করি।

সন্ন্যাসী দর্শনে? কোথায় বলুন তো।

কপিলাবস্তু নগরে।

কপিলাবস্তু নগরে। তবে আমিই সেই সন্ন্যাসী।

আর আমিই সেই রাজপুত্র।

তুমিই সেই রাজপুত্র। হা ভগবান! বলিয়া সেই সন্ন্যাসী কপালে করাঘাত করিতে লাগিলেন।

তথাগত শুধাইলেন, বৎস, তোমার কি হল?

কি হল? কি হতে আর বাকি? নিতান্ত কাষায়ধারী না হলে গলা টিপে তোমাকে এতক্ষণ নিকেশ করে দিতাম।

তোমার অপ্রীতিকর কি এমন করেছি?

কি করতে বাকি রেখেছ। সেদিন কেন তুমি আমার চোখে পড়তে গেলে? তোমাকে না দেখলে আমি তো সংসারে ফিরতাম না। মনে মনে জানতাম স্ত্রী-পুত্র আমার অনুগত, আমার রাজধানী ও প্রজাবৃন্দ রাজভক্ত! এসব অবশ্য মিথ্যা মোহ, কিন্তু সত্য বাস্তবের অভাবে মিথ্যা মোহ নিয়েই তো আমার দিব্য চলে যাচ্ছিল।

মোহ যতই মনোরম হোক, তার ভঙ্গ কি বাঞ্ছনীয় নয়? কারণ মোহ সর্বদাই মোহ।

ওসব তোমার মতো সন্ন্যাসীর পক্ষে প্রযোজ্য, আমার মতো সংসারীর পক্ষে প্রযোজ্য নয়।

এই পর্যন্ত বলিয়া সেই সন্ন্যাসী আবার খেদ করিতে লাগিলেন—হায়, ভগবান এ কি করলে? আমার সন্ন্যাসও নিলে, আবার সংসারও নিলে। এখন আমি দাঁড়াই কোথায়?

হঠাৎ তিনি বুদ্ধদেবের পায়ের উপরে পড়িয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিয়া উঠিলেন, প্রভু, আমাকে দেখেই আপনি সংসার ত্যাগ করেছেন, বুদ্ধত্ব লাভ করেছেন; আমার কাছে আপনি ঋণী; সেই ঋণশোধ করুন, আমাকে শান্তির পথ বলে' দিন।

বুদ্ধ বলিলেন, বৎস, শান্ত হও, আমার যথাসাধ্য করতে ত্রুটি করবো না। তুমি যাতে এক খণ্ড জমি পাও তার ব্যবস্থা করে দেবো, তাতে তুমি শাকসব্জী, তরি-তরকারি উৎপন্ন করো। সে সব বিক্রী ক'রে যা পাও, তা দিয়ে জীবনযাপন করো, অবশ্যই মনে শান্তি পাবে।

বুদ্ধের কথা শুনিয়া সন্ন্যাসী মনঃক্ষুণ্ণ হইয়া বলিলেন, রাজার ছেলে হয়ে সন্ন্যাসকামী হয়ে শেষে কিনা কৃষিকার্য করবো?

ক্ষতি কি? কোন্ রাজা, কোন্ সন্ন্যাসী এর বেশি করতে সমর্থ? এ যে সৃষ্টিকার্য।

বেশ, প্রভু, মনে যদি শান্তি পাই, তাই হবে।

তখন বুদ্ধদেব উক্ত সন্ন্যাসীকে লইয়া শ্রাবস্তীনগরে আসিলেন আর এক শ্রেষ্ঠীকে অনুরোধ করিয়া সন্ন্যাসী যাহাতে খানিকটা জমি পায় তাহার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। শ্রাবস্তী ত্যাগের সময়ে বুদ্ধ সন্ন্যাসীকে বলিলেন, এখানে তুমি কৃষিচর্চা করতে থাকো, আমি আবার যথাকালে ফিরবো। সন্ন্যাসী প্রণাম করিল, বুদ্ধ আশীর্বাদ করিয়া বিদায় হইলেন।

৫

আবার বারো বৎসর অতিবাহিত হইল। নানা দেশে ধর্মপ্রচার করিয়া বুদ্ধ শ্রাবস্তীপুরে ফিরিলেন। নগর প্রবেশের মুখে নগরোপকণ্ঠে সুবিস্তীর্ণ শস্যক্ষেত্রের মধ্যে সুরম্য প্রাসাদ দেখিয়া তিনি এক শিষ্যকে শুধাইলেন—এ কোন্ শ্রেষ্ঠীর।

শিষ্য বলিল, বারো বৎসর আগে যে সন্ন্যাসীকে আপনি এখানে একখণ্ড চাষের জমি দিয়েছিলেন এসব তারই।

বলো কি। বুদ্ধ বিস্মিত হইলেন।

এমন সময়ে সেই ভূতপূর্ব সন্ন্যাসী, প্রভূতপূর্ব রাজা, বর্তমানে ভূস্বামী সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল ও তথাগতকে প্রণাম করিল।

বুদ্ধ বলিলেন, বৎস, একি করেছ?

সেই সন্ন্যাসী বর্তমানে ভূস্বামী বলিল, প্রভু এখন আমাকে দোষ দিলে চলবে কেন? স্বভাবের নিয়মে দুই চার হয়েছে, চার চৌষট্টি হয়েছে—আপনার আশীর্বাদে প্রাপ্ত পাঁচ বিঘা জমি পঁচাত্তর হাজার বিঘায় পরিণত হয়েছে, এখনো বেড়েই চলেছে।

আশা করি আর বিবাহ করনি।

আজ্ঞে না, সেরূপ ভুল আর করবো না, তবে একেবারে উপবাসীও নেই, দ্বাদশটি উপপত্নী রেখেছি।

ঐ শিশুগুলি কার?

উপপত্নীদের দরুণ আমার।

কিন্তু মনে কি শান্তি পেয়েছ?

যে এত পেয়েছে তার আবার শান্তিতে কি প্রয়োজন?

কিন্তু মন কি বোঝে?

মন যাতে অবুঝ না হয়, তার ব্যবস্থা ক'রে রেখেছি।

কি সেই ব্যবস্থা?

নিত্য নব উৎসব উত্তেজনা, নব নব সুখচর্চার দ্বারা বেচারা মনকে সর্বদা এমনি উদ্‌ভ্রান্ত করে রেখেছি যে তার এক মুহূর্ত ফুরসৎ নেই, উন্মনা হবে কি করে? চিন্তাতেই অসুখের সূচনা, অবসরে চিন্তার সূচনা, আমার তিলমাত্র অবসর নেই। প্রভু এখন বেশ সুখেই আছি, অন্ততঃ অসুখী নই।

পুনরায় সংসারী যদি হবে তবে রাজ্য পরিত্যাগ করলে কেন?

তখন অবসর ছিল, তাই ভগবান, পরকাল, আত্মা, মুক্তি প্রভৃতি দুর্মোচ্য চিন্তাজাল ছিল। এখন তিলার্ধ চিন্তার অবসর না থাকায় ও সব ভূত কাছে ঘেঁষতে পারে না। প্রভু, অবসরকে হত্যা করবার সঙ্গে সঙ্গে ত্রিতাপ থেকে মুক্তি পেয়েছি।

কিন্তু যখন মৃত্যুকাল আসন্ন হবে?

সেদিন সংসারের সবগুলো বাতি জ্বালিয়ে দিয়ে নৃত্যে গীতে, খাদ্যে মদিরায়, বিদূষণায় বারাঙ্গনায় প্রলয়োল্লাশ চলবে আমাকে ঘিরে প্রাসাদে—আর সেই মদিরাপিচ্ছিল পথ দিয়ে কখন্ শুট ক'রে চলে যাবো ওপারে জানতেও পারবো না।

তারপরে ?

তারপরে আপনিও যতটুকু জানেন আমিও ততটুকু জানি। - প্রভু, দুঃখ মুক্তির আশায় আপনি ধর্মচক্র প্রবর্তন করেছেন—আর আমি করেছি ঐ উদ্দেশ্যে কর্মচক্র প্রবর্তন। আপনার ও আমার দুই সুখ-তত্ত্বই জগতে চলতে থাকবে। আপনার শিষ্যসংখ্যা কোটি কোটি হবে, কিন্তু আমার অচিহ্নিত শিষ্যসংখ্যাও নিতান্ত অল্প হবে না।

তখন বুদ্ধ বলিলেন, তোমাকে উপদেশ দেওয়ার আর কিছু নাই, আমি এবারে বিদায় হই।

বুদ্ধ রওনা হইবেন এমন সময়ে সেই সন্ন্যাসীর, বর্তমানে ভূস্বামীর দ্বাদশটি উপপত্নী আসিয়া বুদ্ধকে প্রণাম করিয়া বলিল, প্রভু, আমরা আপনার শরণ নিলাম, আমাদের আপনার সঙ্গে নিয়ে চলুন।

বুদ্ধ ভূস্বামীর দিকে তাকাইয়া বলিলেন, তোমার সুখের উপকরণ যে চলল, এখন কি হবে ?

উপপত্নী রাখবার ঐ তো সুবিধা, ও বস্তুর কখনো অপ্রতুলতা ঘটে না। বিশেষ ওদের বয়স হয়ে পড়ায় ওগুলোকে আমিই বিদায় করবো ভাবছিলাম।

বুদ্ধ ভূস্বামীর উপপত্নীসমূহ লইয়া প্রস্থান করিলেন।

ভূস্বামী অর্থাৎ ভূতপূর্ব সেই সন্ন্যাসী একজন অনুচরকে অবিলম্বে একপাত্র উৎকৃষ্ট মাধ্বী আনিতে আদেশ করিয়া সেই দিবস মধ্যেই দ্বাদশটি শূন্যস্থান যাহাতে পূর্ণ হয় সেইরূপ আদেশ করিলেন।

ইহাই হইল সেই সন্ন্যাসীটির প্রকৃত বৃত্তান্ত।

ভৌতিক চক্ষু

১

ইংলণ্ডের বার্কশায়ারের জন ফষ্টারের বালিকা কন্যাকে কেন্দ্র করিয়া যে ভয়াবহ চাঞ্চল্য ইংলণ্ড তথা সমগ্র ইউরোপীয় শিক্ষিত সমাজকে আন্দোলিত করিয়াছিল তাহা চরমে পৌঁছিবার পূর্ব্বেই সহসা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হইয়া যায়। কাজেই ফষ্টার কন্যার ইতিহাস তখন আর কাহারো মনোযোগ আকর্ষণ করিতে পারে নাই। কিন্তু সামগ্রিক মনোযোগের অন্তরালে একটি ক্ষুদ্র ইতিহাসের রক্তিম প্রবাহ শোচনীয় পরিণতি পর্যন্ত নিঃশব্দে প্রবাহিত হইয়া যায়। যাহারা এই কাহিনীর আত্যন্ত জানে তাহাদের বিস্ময় ও ভীতির অন্ত ছিল না। আর তখন যদি বিশ্বযুদ্ধ না বাধিয়া যাইত তাহা হইলে ঘটনাটি ইউরোপীয় সমাজে ভয়াবহতার এক নূতন অধ্যায় সৃষ্টি করিত সন্দেহ নাই। বিশেষ সদ্য সদ্য এই কাহিনীর সমস্ত ঘটনা বিবৃত করাতে, সংশ্লিষ্ট পাত্র পাত্রীর সকলের নামধাম প্রচার করাতে যথেষ্ট আপত্তির কারণ ঘটিতে পারিত। কিন্তু এখন সে সব বাধা অপসারিত, ঘটনা পুরাতন, প্রধান পাত্র পাত্রী-গণ মৃত, কাজেই এতদিন পরে বিষয়টি অসঙ্কোচে বিবৃত হইতে পারে। পুরাতন হওয়া সত্ত্বেও কাহিনীর পাঠক মাত্রেই বুঝিতে পারিবেন ইহার রহস্য ও নিদারুণত্ব এতটুকু হ্রাস পায় নাই।

মিঃ জন ফষ্টার একজন বিত্তশালী ব্যক্তি। বাল্যকালে প্রায় কপর্দ্দকহীন অবস্থায় তিনি কলিকাতায় আসেন। এখানে আসিয়া তিনি এক ইংরেজ সদাগরী আফিসে শিক্ষানবিশ হিসাবে প্রবেশ করেন।

তাঁহার ব্যবসা বুদ্ধি ছিল, অধ্যবসায় ছিল। এমন সময়ে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ বাধিয়া যায়। তখন তিনি পাটের চালান দিয়া এবং অন্যান্য প্রকার ব্যবসায় প্রভৃতি দ্বারা ধনোপার্জ্জন করেন। যুদ্ধান্তে তিনি ক্লাইভ ষ্ট্রীটে জন ফষ্টার এণ্ড কোং নামে নিজ ব্যবসায় ফাঁদিয়া বসেন। এই সময় তিনি একটি পার্শী মহিলাকে বিবাহ করেন। বিবাহের কয়েক বৎসর পরে তাঁহাদের একটি কন্যা জন্মে। কন্যাটির নাম রাখা হয় সোফিয়া। সোফিয়ার বয়স যখন দুই তিন, তখন তাহার মাতার মৃত্যু হয়। পত্নীর মৃত্যুতে ফষ্টারের মনে বৈরাগ্য জন্মায়, সে সমস্ত ব্যবসা বিক্রয় করিয়া দিয়া কন্যাকে লইয়া ইংলণ্ডে ফিরিয়া আসে এবং বার্কশায়ারের অন্তর্গত মিলথর্প নামে ছোট একটি গ্রামে বাড়ী ও জোতজমি কিনিয়া স্থায়ী হইয়া বসে। কন্যাটিকে যত্নে লালন পালন করা,উত্তম শিক্ষাদান করা—ইহাই ফষ্টারের জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য হইয়া দাঁড়ায়। কন্যাটি যেমন বুদ্ধিমতী, তেমনি সুন্দরী, তেমনি সুশীলা, বিশেষ শিক্ষালাভ করায় তাহার আগ্রহ লক্ষ্য করিবার মতো ছিল। তাহাকে গ্রামের সকলেই ভালোবাসিত, এবং অনেকটা তাহারই আকর্ষণে (ফষ্টারের নিজেরও আকর্ষণ ছিল) গ্রামের লোকে ফষ্টারের বাড়ীতে আসিয়া মিলিত হইত। মোটকথা পাঁচ বৎসরের সেই মেয়েটি যেন সাক্ষাৎ লক্ষ্মীরূপা ছিল।

এমন সময়ে এক শোচনীয় দুর্ঘটনা ঘটিল। ফষ্টারের বাড়ীর চার পাশে সবজি ক্ষেত ছিল। সেই সবজি ক্ষেত হইতে পাখী তাড়াইবার উদ্দেশ্যে ফষ্টার ছর্‌রা গুলি ছুঁড়িতেছিলেন। একটি ছর্‌রাগুলি লাগিয়া সোফিয়ার বাম চক্ষুটি একেবারে নষ্ট হইয়া গেল। তখন তাহার সেখানে আসিবার কথা নয়, সে কখন কোথা হইতে আসিল যখন সকলে পরস্পরকে শুনাইতেছে তার অনেক আগেই তাহার চক্ষুটি একেবারে অকর্মণ্য হইয়া গিয়াছে।

এই দুর্ঘটনায় ফষ্টার একেবারে হতবুদ্ধি হইয়া গেলেন। এত বড় আঘাত জীবনে তিনি পান নাই, স্ত্রীর মৃত্যুতেও নয়। এমন সময়ে তাঁহার এক ডাক্তার বন্ধু দেখা করিতে আসিলেন, ভারতবর্ষে থাকিতে তাঁহাদের পরিচয় হইয়াছিল। তিনি সমস্ত শুনিয়া বলিলেন, ফষ্টার এই ক্ষতি অপূরনীয় নয়, আগেকার দিন হইলে অবশ্য অপূরণীয় হইত, কিন্তু এখন বিজ্ঞানের উন্নতির ফলে এ সব রোগ চিকিৎসা সাধ্য হইয়াছে। তিনি জানাইলেন যে "ব্লাড ব্যাঙ্কে" যে প্রক্রিয়ায় রক্ত অবিকৃতভাবে রক্ষিত হয়, সেই প্রক্রিয়ায় সগুমৃত ব্যক্তিদের অক্ষিগোলক অবিকৃত রাখিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। তিনি বলিলেন যে ফষ্টার অর্থব্যয় করিতে রাজি থাকিলে তিনি ব্যবস্থা করিতে প্রস্তুত আছেন।

ফষ্টার বলিলেন, মহাশয়, অর্থব্যয়ে আমি কুণ্ঠিত নই।

তখন ডাক্তারটি বলিলেন যে আমি লণ্ডনে যাইতেছি। তুমি যত শীঘ্র সম্ভব সেখানে কন্যাসহ গিয়া আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবে।

কয়েক দিনের মধ্যেই ফষ্টার সোফিয়াকে লইয়া লণ্ডনে উপস্থিত হইলেন। উক্ত ডাক্তার, নাম বলিতে ভুলিয়া গিয়াছি ডাঃ রিচার্ডস তাহাদের লইয়া সহরের একজন প্রধান চক্ষু চিকিৎসকের কাছে উপস্থিত হইলেন। ডাঃ মেরিগোল্ড অন্যতম শ্রেষ্ঠ চক্ষু চিকিৎসক, আবার সেই সঙ্গে "চক্ষু ব্যাঙ্কের" একজন ডিরেক্টারও বটেন। তিনি সোফিয়ার চক্ষু পরীক্ষা করিয়া অস্ত্রোপচারের দ্বারা নষ্ট চক্ষু উৎপাটন করিয়া ফেলিয়া "চক্ষু ব্যাঙ্ক" হইতে একটি নূতন অক্ষিগোলক পাইবার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। দুই চার দিনের মধ্যেই সোফিয়ার বাম চক্ষুটি উৎপাটিত হইল এবং সে স্থলে সগুমৃত এক ব্যক্তির অক্ষিগোলক আরোপিত হইল। ডাক্তারেরা বলিল—মিঃ ফষ্টার, আর ভয়ের কারণ নাই, আপনি কন্যাকে লইয়া বাড়ী ফিরিয়া যান। কয়েকদিন মধ্যেই পুরাতন চক্ষুতে অভ্যস্ত

হইয়া গেলে সোফিয়া পূর্ববৎ দেখিতে পাইবে, প্রথম কয়েকদিন কিছু কিছু অসুবিধা হয়, তবে তাহাতে চিন্তিত হইবেন না। ফষ্টার ডাক্তারের কথায় আশ্বস্ত হইয়া সোফিয়াকে লইয়া স্বগৃহে ফিরিয়া আসিলেন।

২

পাঁচ সাত দিন পরে সত্য সত্যই সোফিয়া বাম চক্ষুতে নূতন দৃষ্টি লাভ করিল। সেদিন ফষ্টারের কি আনন্দ! তিনি সন্ধ্যাবেলায় গ্রামের লোকদের স্বগৃহে নিমন্ত্রণ করিয়া নাচ গান ও অগ্ন্যুৎসবের আয়োজন করিলেন। গ্রামের সকলেই সোফিয়াকে ভালবাসিত, তাহারাও আনন্দিত হইল। কিন্তু এ হর্ষের কারণ বেশি দিন থাকিল না। নূতন চক্ষু দৃষ্টিলাভ করিবার সঙ্গে সঙ্গে সোফিয়ার আচরণে, দৃষ্টিতে এবং কথা-বার্তায় পরিবর্তন দেখা দিতে সুরু হইল। তাহার মুখের সে লাবণ্যও ধীরে ধীরে অন্তর্হিত হইল।

এখন তাহার মুখ দেখিলে মনে হয়, মুখের হাব ভাব যেন বয়স্ক ব্যক্তির, শুধু তাই নয়, সে ব্যক্তিও আবার যেন নিষ্ঠুর প্রকৃতির। তাহার নূতন চক্ষুটি পুরাতন অপেক্ষা আকারে বড়, কেমন যেন জটিলতায় পূর্ণ, আর সর্বদা রক্তাভ। হঠাৎ দেখিলে ভয় হয়। মনে হয় বালিকার মস্তিষ্কের অভ্যন্তরে কোন এক একচক্ষু শয়তান বাসা বাঁধিয়া একটি ঘুলঘুলি পথে সব যেন দেখিতেছে, সকলের গতিবিধি যেন পর্যবেক্ষণ করিতেছে। অথচ অপর চক্ষুটি করুণাময়ী বালিকার, তাহাতে আসল সোফিয়ার প্রকৃত পরিচয়।

ক্রমে সোফিয়া সম্বন্ধে আরও নানারূপ অবাঞ্ছিত তথ্য লক্ষ্যগোচর হইতে লাগিল। তাহাকে দেখিলে মনে হইত সে যেন সর্বদা কাহার

অনুসন্ধান করিয়া বেড়াইতেছে। কিম্বা মনে হইত ঐ নূতন চক্ষুটি যেন তাহার চালক হইয়াছে আর অসহায় বালিকা তাহারই নির্দেশে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে কাহার সন্ধানে! কি ভয়াবহ ঐ চক্ষুর দৃষ্টি—আর তাহারই ফলে কি নিষ্ঠুর, কি প্রতিজ্ঞা-কঠোর তাহার মুখের ভাব! তাহাকে একাকী অবস্থায় হঠাৎ দেখিলে চমকিয়া ওঠা অসম্ভব নয়।

ক্রমে আরও সব তথ্য প্রকাশ পাইল। ফষ্টারের বহু সংখ্যক গৃহপালিত হাঁস মুরগী ও খরগোস ছিল—আর সেগুলি ছিল বালিকা সোফিয়ার খুব প্রিয়। একদিন সকাল বেলা ফষ্টার আবিষ্কার করিলেন যে গোটা কয়েক হাঁস-মুরগী এবং একটি খরগোস ছিন্ন কণ্ঠ হইয়া পড়িয়া আছে। প্রথম তিনি ভাবিলেন এ কোন ধূর্ত শিয়ালের কীর্তি। কিন্তু পরে তাঁহার মনে হইল—শিয়ালে মৃতদেহ ফেলিয়া যাইবে কেন? তবে কে করিল!

প্রতিদিন ভোরে উঠিয়া ফষ্টার পশুপক্ষীর নূতন নূতন মৃতদেহ আবিষ্কার করিতে লাগিলেন। তিনি ভাবিলেন একি অনৈসর্গিক উৎপাত। কিন্তু শেষে একদিন রহস্য উদঘাটিত হইল, না হইলেই বোধ করি ভালো ছিল। তিনি সেদিন রাত্রি জাগিয়া পাহারা দিয়া বসিয়া ছিলেন, খোলা জানালার কাছে, সম্মুখেই উঠানের মধ্যে গৃহপালিত পশু পক্ষীর জালে-ঘেরা সুবৃহৎ খাঁচা। হাঁসের পাখার ধড়ফড় শব্দে সচকিত হইয়া তিনি দেখিতে পাইলেন যে সোফিয়া খাঁচার দরজা খুলিয়া প্রবেশ করিতেছে এবং মুহূর্ত পরেই আরও দেখিলেন যে একটি হাঁস ছিন্নকণ্ঠ হইয়া ভূতলে পড়িল। ভয়ে বিস্ময়ে তাঁহার গায়ের রক্ত জল হইয়া গেল! একি তাঁহার করুণাময়ী কন্যার কাণ্ড! সে কি মানবী হইতে শয়তানী হইয়া গিয়াছে? কেন? কাহার অভিশাপে?

কিন্তু অধিক ভাবিবার সময় ছিল না, তিনি ছুটিয়া খাঁচার কাছে গিয়া উপস্থিত হইলেন। হঠাৎ পিতাকে দেখিয়া সোফিয়া অপ্রস্তুত হইয়া ঘরের দিকে ছুটিল কিন্তু তৎপূর্বে ফষ্টারের দিকে এমন একটা হিংস্র দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল যে কন্যাবৎসল পিতার মনেও আর সন্দেহ রহিল না যে কোন ক্রূরকর্মা পৈশাচিক আত্মা ঐ অসহায় বালিকার মস্তিষ্কে বাসা বাধিয়াছে। তিনি পরদিনই ডাঃ রিচার্ডসকে সমস্ত অবস্থা জানাইয়া অবিলম্বে একবার আসিতে অনুরোধ করিয়া তারবার্তা প্রেরণ করিলেন।

৩

পরদিন ডাঃ রিচার্ডস আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি যখন ফষ্টারের বাড়ীতে প্রবেশ করেন তখন ফষ্টার ও তাঁহার কন্যা বৈঠকখানা ঘরে বসিয়া ছিলেন। ফষ্টার তাঁহাকে দেখিবার আগেই রিচার্ডস সোফিয়ার নজরে পড়েন আর নজরে পড়িবামাত্র সোফিয়া মহা আক্রোশে তাঁহার দিকে ছুটিয়া গিয়া তাঁহার কণ্ঠ চাপিয়া ধরিতে চেষ্টা করে। কিন্তু তাহার মনের অবস্থা যত ভয়ানকই হোক না কেন সে বালিকা বই তো নয়? ফষ্টার ও রিচার্ডস উভয়ে মিলিয়া তাহাকে নিরস্ত করিলেন এবং তাহাকে গৃহান্তরে পাঠাইয়া দিলেন।

সোফিয়া অন্য গৃহে গেলে কন্যার দুর্ব্যবহারের জন্য ফষ্টার বন্ধুর নিকটে ক্ষমা ভিক্ষা করিলেন। কিন্তু রিচার্ডস বলিলেন—এজন্য আপনি বিচলিত হইবেন না। এই ব্যবহারের জন্য আপনি বা আপনার কন্যা কেহই দায়ী নন। কোথাও কিছু একটা গোলযোগ ঘটিয়াছে! হয়তো ঐ অস্ত্রোপচারের সঙ্গেই ইহার যোগ রহিয়াছে। যাহা হোক আমি এখনই ডাঃ মেরিগোল্ডকে সব জানাইতেছি।

ফষ্টার শুধাইল—আপনার সঙ্গে কি ডাঃ মেরিগোল্ডের এ বিষয়ে আলোচনা হইয়াছে ?

রিচার্ডস—আপনার তার পাইয়া আমি ডাঃ মেরিগোল্ডের কাছে গিয়া সমস্ত বিষয় বিবৃত করি। তিনি কিছুক্ষণ চিন্তায় নিস্তব্ধ থাকিয়া বলিলেন, আপনি যান। আর কোন বাড়বাড়ি দেখিলে আমাকে সত্বর জানাইবেন।

তারপরে রিচার্ডস বলিলেন, এখনই যাহা দেখিলাম তার চেয়ে ভয়ানক আর কি হইতে পারে ? ঐ হতভাগ্য ক্ষুদ্র জীবটির ঘাড়ে যেন খুন চাপিয়াছে। এমন যে কি করিয়া হইল কে বলিবে।

—আর তাহার চোখটি দেখিলেন কি ?

—মুহূর্ত মধ্যে যেটুকু দেখিয়াছি তাহাতে বুঝিতে পারিয়াছি ও তাহার স্বাভাবিক চোখ নয়। সমস্তই কেমন রহস্যময় বোধ হইতেছে। যাহা হৌক, আমি ডাঃ মেরিগোল্ডকে সব জানাইয়া এখনই তার করিয়া দিতেছি।

রিচার্ডস একটু শান্ত হইলে ফষ্টার তাহাকে সোফিয়ার আচরণ, হিংস্র ব্যবহার সম্বন্ধে আনুপূর্ব্বিক সমস্ত নিবেদন করিলেন। রিচার্ডস বলিলেন, ডাঃ মেরিগোল্ডের পরামর্শ না জানা পর্যন্ত এ সমস্ত সহ্য করা ছাড়া উপায় নাই। তবে যতটা সম্ভব সোফিয়াকে চোখে চোখে রাখিতে হইবে। আর আশা করিতেছি আগামী কল্যই ডাঃ মেরিগোল্ডের নিকট হইতে একটা চিঠি বা তার পাইব।

কিন্তু পরদিন দেখা গেল যে চিঠি বা তারের বদলে স্বয়ং ডাঃ মেরিগোল্ড আসিয়া উপস্থিত। তখন রিচার্ডস ও ফষ্টার বৈঠকখানায় বসিয়া ছিলেন, এমন সময়ে মেরিগোল্ডকে ঢুকিতে দেখিয়া দুইজনে

বিস্মিত আনন্দে তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিলেন। মেরিগোল্ড যথাবিধি প্রত্যুত্তর দিয়া সোফিয়ার বিবরণ জানিতে চাহিলেন।

ফষ্টার বলিলেন—সে বোধ হয় পাশের ঘরেই আছে।

এমন সময় এরূপ এক অপ্রত্যাশিত কাণ্ড ঘটিল যাহা পূর্বদিনের ঘটনার চেয়েও ভয়ঙ্কর। বালিকা সোফিয়া উনুন খোঁচাইবার লৌহদণ্ড বা পোকার হাতে লইয়া "ঐ আমার হত্যাকারী" বলিয়া মেরিগোল্ডের দিকে ধাবিত হইল। মুহূর্ত মধ্যে রিচার্ডস ও ফষ্টার তাহার উপরে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া লৌহদণ্ড কাড়িয়া না লইলে মেরিগোল্ডের অবস্থা কি হইত তাহা ভাবিতেও ভয় করে।

ফষ্টার বলিল—আর উহাকে ছাড়া রাখা উচিত নয়—

এই বলিয়া কন্যাকে পাশের ঘরে লইয়া গিয়া ঘরটি অর্গল বন্ধ করিয়া দিল—

তারপরে ফিরিয়া আসিয়া ডাঃ মেরিগোল্ডের নিকটে যথারীতি ক্ষমা প্রার্থনা করিল।

কিন্তু ডাঃ মেরিগোল্ড রিচার্ডস ও ফষ্টার উভয়কে বিস্মিত করিয়া দিয়া বলিলেন যে—মহাশয় আমারই উচিত আপনার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করা!

—কেন?

—তবে সব কথা বলি শুনুন! যাহা ঘটিয়াছে তজ্জন্য আমাকে ঠিক দোষী বলা চলে না—কিন্তু আমার আরও ভাবিয়া কাজ করা উচিত ছিল।

এই বলিয়া তিনি যাহা প্রকাশ করিলেন তাহা যেমন ভীতিজনক, তেমনি বিস্ময়কর।

ডাঃ মেরিগোল্ড বলিলেন—এই চক্ষুটি স্মিথ নামে একজন হত্যাকারীর, তাহার ফাঁসির হুকুম হয়—এবং প্রধানতঃ তাহা আমার

সাক্ষ্যের উপরে নির্ভর করিয়াই হয়। ফাঁসির দু'দিন আগে কি তাহার মনে হইল—সে নির্দেশ দিয়া যায় যে মৃত্যুর পরে তাহার বাম চক্ষুটি যেন 'চক্ষুব্যাঙ্কে' দান করা হয়। সেই নির্দেশ অনুসারে তাহার চোখটি ব্যাঙ্কে আসে এবং রক্ষিত হয়। সোফিয়ার জন্য যখন চোখ সন্ধান করিতে আপনারা যান, তখন ঐ চোখটিই ছিল সব চেয়ে সদ্য আনীত। তাই আমি ঐ চোখটি পাইবার ব্যবস্থা করিয়া দিই।

ডাঃ মেরিগোল্ড বলিতেছেন—তার ২।৩ দিন পরেই কোন সূত্রে স্মিথের একটি ডায়ারী আমার হস্তগত হয়। ডায়ারীখানি আমার বিরুদ্ধে হিংসাময় উক্তিতে পূর্ণ। আমার সাক্ষ্যে তাহার ফাঁসি হয় বলিয়া আমার উপরে সে জাতক্রোধ হয়—তেমন ক্রোধ একমাত্র নিশ্চিত মৃত্যুপথযাত্রীর দ্বারাই সম্ভব। সে লিখিয়াছে যে আমাকে হত্যা করিতে না পারিয়া সে নিষ্ফল আক্রোশ লইয়া মরিতেছে। তাহার ব্যর্থকামনা পূর্ণ করিবার উদ্দেশ্যে সে চোখটি দিয়া যাইবে—যে ব্যক্তি পরে উহা গ্রহণ করিবে সে যেন তাহার অভিলাষ পূর্ণ করে—এই আকাঙ্খা লইয়া সে মরিয়াছে!

ডাঃ মেরিগোল্ড আরও বলিলেন—এখন দেখিতেছি তাহার আকাঙ্খা পূর্ণ হইবার উপক্রম হইয়াছিল। প্রথমে সোফিয়া যে রিচার্ডস্-কে হত্যা করিতে গিয়াছিল—তাহা আর কিছুই নহে, রিচার্ডসকে আমি বলিয়া ভুল করিয়াছিল। তারপরে আমার উপরে যে আক্রমণ হয়—তাহা তো আপনারা জানেন। ভাগ্যে সোফিয়া বালিকা তাই তাহাকে সহজে নিরস্ত করা গেল। কিন্তু এমন যে সম্ভব—অর্থাৎ এক মৃত ব্যক্তির চক্ষু তাহার অপূর্ণ আকাঙ্খার জের যে বহন করিতে সক্ষম, বিজ্ঞান ইহা স্বীকার করে না। কিন্তু এরূপ ঘটনা যে মোটেই অসম্ভব নয়—তাহা তো চোখেই দেখিলাম।

ব্যাকুলভাবে ফষ্টার শুধাইলেন—এখন ঐ শয়তানের হাত হইতে আমার কন্যাকে উদ্ধার করিবার কি উপায়?

—তাহাই তো ভাবিতেছি।

এমন সময়ে পাশের ঘর হইতে সোফিয়ার আর্তনাদ উঠিল। দরজা খুলিয়া সকলে সবেগে প্রবেশ করিয়াই বজ্রাহতবৎ দাঁড়াইল। এবং মুহূর্ত পরেই ফষ্টার কন্যার বুকের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িয়া কাঁদিয়া উঠিল।

সকলে দেখিল সোফিয়ার বাম চক্ষুতে একটি Poker আমূল বিদ্ধ—সে মৃত্যুযন্ত্রণায় ছটফট করিতেছে—আর, বাবা আমাকে বাঁচাও! বাবা, বিষম কষ্ট বলিয়া চীৎকার করিতেছে।

নূতন চক্ষু লাগাইবার পরে সোফিয়া এই প্রথম 'বাবা' সম্বোধন করিল—এতদিনের মধ্যে একবারও 'বাবা' বলিয়া ফষ্টারকে ডাকে নাই।

এত দিন পরে হতাশ হইয়া শয়তান বোধ করি তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া গেল—এবং যাইবার সময়ে সোফিয়ার অকৃতকার্যতার দণ্ডস্বরূপ চক্ষুটি হরণ করিয়া গেল।

কয়েক মিনিটের মধ্যেই সোফিয়ার প্রাণহীন দেহ পিতার কোলে শান্তভাবে শায়িত হইল। ইহাই সেই অদ্ভুত 'ভৌতিক চক্ষুর' সাকুল্য বিবরণ—এখন প্রথম প্রচারিত হইল।

খেলনা

শরৎচন্দ্র বলিয়াছেন ভূতের গল্প গল্পের রাজা। কথাটা মিথ্যা নয়। ভূত আছে কি না জানি না, তবে গল্পে বর্ণিত ভূত আছে এবং তাহার অস্তিত্ব নির্ভর করে গল্প বলিবার ভঙ্গির উপরে। হাঁ, বিনয়বাবু গল্প বলিতে পারেন বটে। আমরা পাঁচ সাতটি বয়স্ক জীব 'পততি পতত্রে' অবস্থায় জড়ো সড়ো হইয়া বসিয়া আছি।

বাহিরে অবিশ্রাম ধারা পতন শব্দ, তার সঙ্গে মিশিয়াছে একটানা ঝিঁঝির ডাক, ঘনান্ধকার শ্রাবণ রাত্রির যেন মাথা ঝিম ঝিম করিতেছে। মাঝে মাঝে স্বপ্নগ্রস্তের গর্জনের মতো চাপা মেঘের গর গর ধ্বনি, ঘরের জানলা ছুটো খোলা রহিয়া রহিয়া ভিজা হাওয়ার দমকা ঘরে ঢুকিয়া মোমবাতির শিখাটাকে নাচাইয়া দিতেছে, ঘরময় আলোছায়া কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছে। এ হেন অবস্থায় আমরা পাঁচসাতজনে পাশাপাশি ঘেষাঘেষি বসিয়া আছি—স্বতন্ত্র একখানি চেয়ারে বসিয়া বিনয়বাবু গল্প বলিতেছেন।

প্রথমে কিভাবে ভূতের গল্পের সূত্রপাত হইল মনে নাই, খুব সম্ভব স্থানকালের মাহাত্ম্যে গল্পের স্রোত আপনি ভূতের গল্পের মহাসমুদ্রে আসিয়া পড়িল, বিনয়বাবু সেই মহাসমুদ্রে কর্ণধার হইয়া বসিলেন। হাঁ, তিনি গল্প বলিতে জানেন বটে, এতদিন তাঁহাকে নিপুণ হোমিও-প্যাথি ডাক্তার মাত্র বলিয়াই জানিতাম।

"হাঁ ব্রহ্মদৈত্যের কথা যদি উঠল, তবে শুনুন একটা ঘটনা দেখেছিলাম বটে—"

বিনয়বাবু: গল্পের ধারার আর শেষ নাই, এতও জানেন, আর সবই প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার অন্তর্গত।

অনাদিবাবু বলিলেন, বিনয়বাবু—একটু দয়ামায়া রেখে বলবেন, এই অন্ধকারে বাড়ী ফিরতে হবে।

আহা থামুন না, বলুন বিনয়বাবু—কথাগুলি বলিলেন বৈদ্যনাথবাবু। তাঁহারই বাড়ী, কাজেই তাঁহার বাড়ী ফিরিবার সমস্যা নাই।

প্রমথবাবু বলিলেন, না হয় এখানেই কোনরকমে রাতটা কাটিয়ে দিলে হবে, বলুন বিনয়বাবু।

"ময়নাডাঙা বলে সাওতাল পরগণার একটা গাঁয়ে গিয়েছিলাম একটা রুগী দেখতে। কতদিন আগে, বোধ করি বছর দশেকই হবে, ফিরবার পথে মাঠের মধ্যে নেমে এলো এমনি অন্ধকার আর এমনি দুর্যোগ—"

সন্ধ্যা হইতে গল্প চলিতেছে, আমরা সকলেই সাধ্যমতো দুটি একটি গল্প বলিয়াছি যদিচ বিনয়বাবুর গল্পের তুলনায় সে সব কিছুই নয়, কিন্তু গদাধরবাবু একেবারে নীরব। তিনি প্রথম হইতে এ পর্যন্ত একটি শব্দও করেন নাই, গল্প বলিবার অনুরোধ অজ্ঞতার অজুহাতে এড়াইয়া গিয়াছেন। সেই হইতে গালে হাত দিয়া নিঃশব্দে বসিয়া আছেন। আমরা সকলেই পরস্পরকে দীর্ঘকাল জানি, কেবল গদাধরবাবুই নবাগন্তুক; ছোট একটি বাসা ভাড়া লইয়াছেন; সংসারে তিনি আর তাঁর স্ত্রী; দুজনেরই বয়স হইয়াছে, সন্তানাদি নাই; তাঁহারা কাহারো সঙ্গে বড় মেশেন না; মাঝে মাঝে সন্ধ্যাবেলায় তিনি বৈদ্যনাথবাবুর বৈঠকখানায় আসিয়া বসেন, আজও আসিয়াছিলেন এবং ভূতের গল্পের ফাঁদে ধরা পড়িয়া আটকাইয়া গিয়াছেন, তাঁহার স্ত্রীকে বাড়ীর বাহির হইতে দেখা যায় না বলিলেই হয়।

বিনয়বাবু [illegible] অভিজ্ঞতা শেষ হইলে সকলে আরও জমাট বাঁধিয়া বসিল, এবং সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিল ভূত দেখিবার আগ্রহ কাহারো নাই, এমন কি এমন সাহসী বিনয়বাবু অবধি বলিয়া ফেলিলেন, যা দেখেছি, নূতন করে দেখবার আর শখ নেই, ওতে নার্ভ-এর উপরে বড় পীড়ন হয়ে থাকে।

আপনাদের সঙ্গে একমত হতে পারলাম না।

সকলে গদাধরবাবুর কথায় চকিত হইয়া উঠিয়া শুধাইল, কেন বলুন তো।

পরলোকগত আত্মাকে দেখবার আগ্রহ যে কি অসীম তার একটি ঘটনা জানি।

বলুন, বলুন।

এতক্ষণ চুপ করে ছিলেন কেন?

গদাধরবাবু আরম্ভ করিলেন, আমি উৎকর্ণ হইয়া রহিলাম, গল্পের সূত্রে নিঃসঙ্গ নিভৃতচারী এই পরিবারটির অন্তরঙ্গ রহস্যের কিছু কিঞ্চিৎ পরিচয় পাইব আশাতে।

এক সহরে এক নববিবাহিত দম্পতি ছিল, নবীন তাদের বয়স, গভীর তাদের প্রেম, টাকাকড়ি তাদের বেশী ছিল না, কিন্তু তারা পরস্পরকে নিয়ে এমনি বিভোর হয়ে ছিল যে সামান্য অন্নবস্ত্রের অভাব তাদের চোখেই পড়ত না। বিবাহের কয়েক বছর পরে তাদের চূড়ান্ত সৌভাগ্যকে উজ্জ্বল করে একটি কন্যা জন্মালো। পাহাড়ের চূড়ায় পড়ল বালার্ক কিরণ। মেয়েটি হল তাদের ধ্যান জ্ঞান জীবন, স্বামী-স্ত্রীর মিলিত জীবনের বাহ্যপ্রতীক। দীঘির জল যতই বাড়ে পদ্মের নাল ততই লম্বা হয়, জলতল পদ্মকে আর স্পর্শ করতে পারে না। বাপ মায়ের ভালবাসা প্রতিদিন কেঁপে উঠছে কিন্তু তবু যেন মেয়েকে আচ্ছন্ন

করতে পারতো না, একটুখানি ফাঁক আর পূর্ণ হতে চায় না। ঐ যে একটুখানি অপূর্ণতা হয়তো ওতেই প্রেমের মাধুর্য।

ওরা যে বাড়ীতে থাকতো সেটা বড় নয়, গোটা তিনেক মাত্র ঘর যে ঘরটায় মেয়েকে নিয়ে ওরা শুতো, তার পাশের ঘরটা ছিল মেয়ের খেলবার ঘর। এখন তার বয়স তিন। ছোট্ট ঘরটি বাপ মায় মিলে নানারকম পুতুল দিয়ে সাজিয়ে দিয়েছিল। বাপ যেতো আফিসে, মা যেত রান্নাঘরে, মেয়েটি খেলাঘরে বসে আপনমনে খেলনাগুলো নিয়ে খেলা করতো। সন্ধ্যাবেলায় বাপ মা এসে যোগ দিতো তার খেলায়। কত রকম খেলা। বাপ সাজতো খদ্দের, মা সাজতো ফুলওয়ালী, মেয়েটি সাজতো দোকানী—এই রকম কত কি। আবার পুতুলগুলো পরস্পরের সঙ্গে যে কথাবার্তা বলতো, বাপ মাকে তা শুনতে হত, শ্রবণেন্দ্রিয়ের অপটুতা বা শক্তিহীনতার অজুহাত একেবারেই চলতো না, আর পুতুলের বিয়ের ঘটকালি! সে তো বাপের অবশ্য কর্তব্যের প্রধানতম অঙ্গ, ঘটক বিদায়ের ভার যেমন মায়ের উপরে। এমনি চলতো ঘুমে তার চোখ ভরে আসা অবধি। বাপ মায়ে ভাবতো সন্ধ্যা সারাদিনব্যাপী হয় না কেন?

তাদের ভাবনাই শেষে সত্য হ'ল, সন্ধ্যার অন্ধকার দিনের আলো মুছে দিয়ে জীবনব্যাপী হ'ল, মাত্র তিন দিনের অসুখে অসমাপ্ত পুতুলখেলা ফেলে রেখে মেয়েটি চলে গেল।

বাপ মায়ের মনের অবস্থা বর্ণনা করতে আমি পারবো না, অতএব সে চেষ্টা থাক। শুনেছি শোকে লোক পাগল হয়ে যায়, তারা তো সুখী, আপন দুঃখ বুঝতে পারে না। লোকে কান্নাকাটি করে, তারাও সুখী বুকের ভার গ'লে নেমে যায়। ওরা না হল পাগল, না করলো কান্নাকাটি, কেবল পরস্পরের চোখের দিকে কখনো তারা তাকাত না,

আছে প্রকৃতিস্থতার ছলনাটুকু এক নিমেষে ভেসে যায়। বাইরে থেকে সংসার যেমন চলছিল তেমনি চলতে লাগলো তবে খেলাঘরটি মেয়ের জীবনকালে যেমন ছিল তেমনি রইলো, খেলনাগুলি গুছিয়ে একদিকে রেখে দিল পারৎপক্ষে সেখানে তারা কখনো ঢুকতো না।

এক দিন অনেক রাত্রে বাপ ঘুম ভেঙে গিয়ে শুনতে পেলো পাশের ঘরে শব্দ, ঠিক কে যেন খেলনাগুলো নাড়ছে। সে ধীরে ধীরে পত্নীকে ডাকলো ; সে জেগেই ছিল, বলল আমি অনেকক্ষণ থেকে শুনছি।

ও ঘরে যাবে কি ?

পত্নী কি ভেবে বলল, না, না। এমনি কিছুক্ষণ চললো, তার পরে শব্দ থেমে গেল ; ওরা ঘুমিয়ে পড়লো।

পরদিন প্রাতঃকালে উঠেই ওরা খেলাঘরে প্রবেশ করলো, এ কি ! বাক্সবন্দী খেলনাগুলি কে পরিপাটি করে সাজিয়ে রেখেছে, ঠিক যেমন করে ওদের মেয়ে পরী সযত্নে সাজিয়ে রাখতো। এই প্রথম ওদের চোখে জল এলো, ওরা জড়বৎ দাঁড়িয়ে রইলো, কেবল দুজনের চোখে কয়েকটি জলধারা গড়াতে লাগলো। লুব্ধ প্রত্যাশায় ওরা খেলনাগুলো গুছিয়ে রেখে চলে এলো।

সেদিন অনেক রাত্রে আবার ওরা ঘুম ভেঙে সেই শব্দ শুনতে পেলো। কে যেন খেলনাগুলো বের করে সাজিয়ে রাখছে। বাপ বলে উঠল—আমি যাবই, মা হাত ধরে নিষেধ করলো, না, না, ও ভয় পাবে।

তবে কি দেখবো না ?

না, শুনেই সন্তুষ্ট থাকো, দেখা দেবার হলে আপনি দেখা দেবে।

কিছুক্ষণ পরে, বোধ করি খেলনাগুলো সাজানো হয়ে গেলে শব্দ থেমে গেল। ওরাও ঘুমিয়ে পড়লো।

পরদিন খেলাঘরে ঢুকে ওরা দেখলো আগের দিনের মতো খেলনাগুলো সাজানো।

ওরা খেলনাগুলো গুছিয়ে রাখলো।

সেদিন রাত্রে ওরা আর ঘুমোল না, জেগেই রইলো। অনেক রাত্রে খেলাঘরে কার ছোট্ট তুটি পায়ের শব্দ শুনতে পেলো। খেলনাগুলো বার করবার শব্দ, সেই সঙ্গে—অভিমানী কণ্ঠস্বরের মৃত্তু কুণ্ঠিত—"রোজ রোজ সাজিয়ে রাখি, রোজ রোজ কে নষ্ট করে দেয়।"

এ স্বর কি চিনতে ভুল হতে পারে? এ যে তাদের হৃদয়ে বেদনার বজ্রাঙ্কুশে খোদিত, তুজনে একসঙ্গে ডুকরে কেঁদে উঠল—আর তুজনে একত্রে খেলাঘরে গিয়ে প্রবেশ করলো। ঘর শূন্য। খেলনাগুলো মেঝের উপর ছড়ানো, সাজাবার সময় হয়নি।

তুজনে এদিকে ওদিকে দেখলো, বাইরে দেখলো, সর্বব্যাপী অন্ধকার ছাড়া কিছু কোথাও নেই। তখন তারা খেলনাগুলো বুকে জড়িয়ে ধরে মেঝের উপরে পড়ে সারারাত্রি কাঁদলো—ওরে বাছা, ওরে পরী, তোর হাতের শব্দ শুনবার আশাতেই আমরা খেলনাগুলো বাক্সে বন্ধ করে রাখতাম। অভিমান করিসনে। দেখা দে।

কিন্তু সেই শেষ, আর না পেয়েছে তারা শব্দ, না শুনেছে সে কণ্ঠস্বর। কত দীর্ঘ রাত তারা বিনিদ্র কাটিয়েছে, কতবার খেলা ঘরে চুপি চুপি উঁকি মেরেছে, কোথাও কিছু দেখতে পায়নি। সেই অভিমানসিক্ত কণ্ঠস্বর, অশ্বত্থপত্রশীর্ষে দোতুল্যমান অশ্রুবিন্দুর মতো তাদের হৃদয়ের প্রান্তে রয়ে গিয়েছে, এখনো আছে ঘটনার আজ কুড়ি বৎসর পরেও।

কিছুক্ষণের জন্য গদাধরবাবু থামলেন, তারপরে বললেন, পরলোকগত আত্মা দেখবার কি আগ্রহ জানে তারা, সেই হতভাগ্য পিতামাতা।

গল্প শেষ হ'ল।

এই আবছায়া আলোতেও দেখতে পাওয়া গেল গদাধরবাবুর চোখে কুড়ি বৎসরের পুরাতন সেই অশ্রুবিন্দু তেমনি ঢুলছে। বুঝতে পারা গেল কারা সেই হতভাগ্য পিতামাতা।

আসর ভঙ্গ হ'ল, বৃষ্টি কিছুক্ষণের জন্য ধরেছিল, সেই সুযোগ নিয়ে সবাই নীরবে চলে গেল। আমি একা বাইরের বারান্দায় এসে দাঁড়ালাম।

দেখলাম শ্রাবণের রাত্রি তেমনি ঘনান্ধকার দুর্যোগময়ী। মাঝে মাঝে বিদ্যুতের ডালপালা মেলায় যে আলোকটুকু হচ্ছিল, যে-দৃশ্যটুকু ক্ষণে ক্ষণে প্রকাশিত হচ্ছিল তাতে করে সে রাত্রিকে নিরবচ্ছিন্ন ভয়ঙ্করী বলে আর মনে হল না, মনে হল এর মধ্যেও কোথায় যেন একটুখানি মাধুর্য, কোথায় যেন একটুখানি সৌন্দর্য আছে, সদ্যমৃতের ওষ্ঠাধরে সহজ প্রসন্ন হাসির রেখাটির মতো।

ফাঁসি-গাছ

আমাদের গ্রাম থেকে রেল স্টেশনে পৌঁছবার পথের মাঝামাঝি জায়গায় একটি প্রকাণ্ড গাছ ছিল। গাছটি একটি বনস্পতি, যেমন বিশাল, তেমনি প্রাচীন ; আর সেটা যে কি গাছ তার পরিচয় কেউ জানতো না। এদেশের উদ্ভিদের সঙ্গে তার গোত্রের মিল ছিল না। চারদিকের বৃক্ষরাজির মধ্যে সেই বলিষ্ঠ, সমুন্নত, অজ্ঞাতকুলশীল বৃক্ষটি, পাণ্ডব-সৈন্যসমাবেশের মধ্যে যেন ঘটোৎকচ। স্বভাবতই বৃক্ষটি দৃষ্টি আকর্ষণ করবার মতো, কিন্তু তার আরও কারণ ছিল, সেটি ছিল একটি ফাঁসি-গাছ। লোকে বল্‌তো—নবাবী আমলে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত ব্যক্তিদের ফাঁসি দেবার জন্য গাছটি ব্যবহৃত হ'ত। কাছেই একটি গ্রামে থাকতো নবাবের ফৌজদার ; প্রাণদণ্ড দেবার ক্ষমতা ছিল তার ; কোন ব্যক্তির প্রাণদণ্ডের আদেশ হ'লে জল্লাদে লোকটাকে ঝুলিয়ে দিতো গাছটির একটি ডালে। মানুষ ঝুলিয়ে দেবার মতো ডালগুলোই বটে। গাছটির গুঁড়ি থেকে পঁচিশ-ত্রিশ হাতের মধ্যে কোন ডালপালা নেই, একেবারে পরিষ্কার, গা মসৃণ তার উপরে ডাল বেরিয়েছে ; এক-একটা ডাল কি লম্বা, একেবারে গ্রামান্তরে গিয়ে যেন পৌঁছয়, এমনি থাকে থাকে সুবিন্যস্ত ডাল উঠে গিয়েছে ; যতই উঁচুতে উঠেছে ততই ডালের দৈর্ঘ কম ; সব সুদ্ধ মিলে গাছটি উপরের দিকে ছুঁচালো—মন্দিরের আকৃতি। গাঁয়ে গোপাল বলে একজন বৃদ্ধ মুসলমান কৃষাণ ছিল, সে বল্‌তো তার ঠাকুর্দা নাকি ঐ গাছে ফাঁসি দিতে দেখেছে, সেটাই ছিল নাকি ঐ গাছে শেষ ফাঁসি-লটকানো। গোপালের বয়স

তখন ছিল বিরানব্বই। গোপালের কথা সত্য হ'লে তার ঠাকুর্দার সময় নবাবী আমলের শেষে পড়ে বটে; আর তার মুখে এ গল্পটাও শুনেছি আমার বাল্যকালে, কাজেই গোপালের বিরানব্বই-এর সঙ্গে আমার বয়সের মোটা একটা অঙ্ক জুড়ে নেওয়া উচিত।

যাই হোক, শেষ ফাঁসির বর্ণনা সত্য হোক আর নাই হোক, গাছটা যে ফাঁসি-গাছ ছিল তা নিঃসন্দেহ। জেলা গেজেটিয়ার পুস্তকে ফৌজদার-অধ্যুষিত ঐ গ্রামটির উল্লেখ আছে, আরও উল্লেখ আছে যে কাছাকাছির গাছগুলোতে ফাঁসি দেওয়া হ'ত। তা যদি হয় এমন যোগ্য গাছটির ব্যবহার না হ'বার কথা নয়।

কিন্তু প্রাচীন ইতিহাস যাক। যা বলতে বসেছি তা হচ্ছে ঐ ইতিহাসের স্মৃতি। সেদিনের বিষাক্ত স্মৃতি আজও গাছটিকে ভয়াবহ ক'রে রেখেছিল। কেউ পারৎপক্ষে রাতের বেলায় গাছটির কাছে যেতো না, একা তো নয়ই। কিন্তু অদৃষ্টের এমনি বিড়ম্বনা যে, না গিয়েও উপায় ছিল না, রেল স্টেশনে যাবার সড়কের ঠিক পাশেই তার অবস্থান। কত নিঃসঙ্গ পথিক যে রাতের বেলায় ওখানে এসে দব্‌কে মূর্চ্ছা গিয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। তাদের প্রশ্ন করলে বলতো—কি দেখলাম? তা কি এখন মনে আছে? তবে মনে হ'ল গাছের ডালে সারি সারি যেন মৃতদেহ ঝুলছে!

আবার কেউ বা বলতো মুমূর্ষুর অন্তিম আর্তনাদ স্পষ্ট শুনেছে। একজন বলেছিল, সে লোকটা বিদেশী—গাছের ইতিহাস জানতো না, ঐ গাছতলায় পৌঁছুবামাত্র হঠাৎ একটা মৃতদেহ ধপ্‌ করে তার পায়ের কাছে পড়ল; সে চমকে উপর দিকে তাকিয়ে দেখে যে গাছের ডালে লম্বা একটা দড়ি ঝুলছে। প্রশ্নের খোঁচা খেয়ে সে বলল যে, সেটা ছিল জ্যোৎস্না রাত্রি, তার ভুল দেখবার কিছুমাত্র সম্ভাবনা ছিল না।

তবে এ বিষয়ে সন্দেহ ছিল না যে এসব অভিজ্ঞতা প্রত্যক্ষ হওয়া সত্ত্বেও সত্য হতে পারে না, কেন না, ফাঁসি হ'ত বহুকাল আগে। তার সেদিনের স্মৃতি যদি কোন অলৌকিক সুড়ঙ্গ পথে আজ মূর্তি ধ'রে দেখা দেয়, তবে সে স্বতন্ত্র কথা, যুক্তি দিয়ে তা প্রমাণ-অপ্রমাণ করবার পথ বন্ধ।

কিন্তু যুক্তি এক আর বিশ্বাস আর। লোকের মনের ব্যাপক বিশ্বাসই এখন তথ্যের স্থান গ্রহণ করেছিল, আর তা-ই ছিল যথেষ্ট। ফলে ঐ গাছটা যাতায়াতের পথের পাশে ভীতমিশ্রিত একটা প্রকাণ্ড বিস্ময়ের চিহ্নের মতো দণ্ডায়মান ছিল।

তারপরে বয়স বাড়লে কলকাতায় গেলাম কলেজে পড়তে। আমাদের মেসে একজন বয়স্ক ব্যক্তি থাকতেন, তাঁর থিওজফি চর্চার বাতিক ছিল। তাঁর সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল। তাঁকে ফাঁসি গাছটির বিবরণ শুনিয়েছিলাম। তিনি কিছুমাত্র বিস্ময় প্রকাশ না ক'রে বললেন, এমন হওয়া মোটেই অসম্ভব নয়। তিনি বুঝিয়ে দিলেন যে, যেখানে কোন মর্মান্তিক মৃত্যু ঘটে থাকে, সেখানে পরবর্তী কালে সেই মৃত্যুদৃশ্যের ঠিক পুনরভিনয় মাঝে মাঝে ঘটে থাকে। কেন এমন হয়, তিনি বললেন, তিনি জানেন না। কিন্তু এমন দৃষ্টান্ত অনেক আছে। মৃত্যুর সময়ে মানুষগুলো যে মানসিক যন্ত্রণা অনুভব করেছিল, সেই নিদারুণ তাড়নাতেই ওখানে ঐ রকম অলৌকিক ছায়াছবি উদ্ভূত হ'য়ে থাকে বলে তিনি মনে করেন।

বলা বাহুল্য এ ব্যাখ্যা আমার মনঃপূত হ'ল না, কিন্তু ও নিয়ে আর তর্কবিতর্ক করিনি।

তার পরে কর্মজীবনে প্রবেশ করলাম এবং চাকুরি উপলক্ষ্যে নিজের গ্রাম থেকে এক প্রকার নির্বাসিত হ'লাম। বহু কাল, জীবনের ছুটি

দশক কাটলো দেশে এবং দেশান্তরে। এই সময়ের মধ্যে স্বগ্রামে যাওয়ার সুবিধে হ'য়ে ওঠেনি। কালক্রমে গ্রামের ছবি মনে ঝাপসা হয়ে এলো। রেল স্টেশনে নেমে গ্রামে যাওয়ার পথে যে সব দৃশ্য, বাড়িঘর, গাছপালা, এমনকি মানুষের যে মুখগুলো যাতায়াতের পথের পাশে দেখতে পেতাম ক্রমে ক্রমে ভুলে গেলাম, সেই সঙ্গে ফাঁসি-গাছটার স্মৃতিও মন থেকে মুছে গেল।

প্রায় কুড়ি বছর পরে গ্রামে চলেছি। সন্ধ্যাবেলায় নামলাম স্টেশনে, একখানা টমটম গাড়ি ভাড়া করলাম, বারো মাইল পথ, পৌঁছতে এক প্রহর রাত হবে। পথ চল্‌তে চল্‌তে পুরাতন ছবিগুলো জন্মান্তরের স্মৃতির মতো একে একে মনে আসতে লাগলো, মনে হ'ল যেন ধীরে ধীরে নিজের অতীত কালের মধ্যে প্রবেশ করছি; রাত তখন অন্ধকার হ'য়ে এসেছে, মাঝামাঝি পথে এসে পড়েছি, এমন সময়ে সেই ফাঁসি গাছটার কথা মনে পড়লো। ভয় হ'ল না, সঙ্গে তো গাড়ির গাড়োয়ান আছে, কৌতূহল হল খুব। অভিনব কিছু দেখা যায় কিনা ভেবে সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলোকে সজাগ ক'রে নিয়ে স্থির হয়ে বসলাম। এবারে বোধ করি ফাঁসি-গাছের কাছে এসে পড়েছি, রাস্তার বাঁ দিকে গাছটা। ঐ তো গাছটা! কি বিরাট! অন্ধকারের আবছায়ার মধ্যে আরও বিরাট দেখাচ্ছে, সহস্র শাখা-প্রশাখায় অন্ধকারের আলখাল্লা প'রে যেন এক গৈবী অতিকায় পুরুষ। লোকে যে ভয় পাবে তা আর আশ্চর্য কি। আমারই সর্বাঙ্গ শির শির ক'রে উঠল। নির্বিপাকে গাছতলা অতিক্রম ক'রে গেলাম। কিছুদূর এসে গাড়োয়ান বল্‌ল, বাবু, এখান দিয়ে আগে রাতের বেলায় যাওয়া বড় কঠিন ছিল।

—কেন?

—ফাঁসি-গাছটার ভয়ে।

কান খাড়া ক'রে সজাগ হ'য়ে উঠলাম, শুধোলাম—এখন বুঝি সাহস বেড়েছে?

—সাহস বাড়তে যাবে কেন? ভয়ের ব্যাপার তো আর নেই।

—গাছটার ভূত ছেড়ে গিয়েছে বুঝি?

—গাছটাই যে গিয়েছে।

—কোথায় যাবে?

—আপনি বুঝি এ পথে অনেকদিন আসেন নি! তাই জানেন না।

—কি ব্যাপার বলো তো!

সে আরম্ভ করলো—বছর পাঁচেক আগে একবার বৈশাখী ঝড়ের সময়ে গাছটার মাথায় বাজ পড়ে আগাগোড়া পুড়ে গেল। একটা বাজ যে অতবড় একটা গাছকে পুড়িয়ে আঙার ক'রে দিতে পারে, না দেখলে বিশ্বাস করা শক্ত।

—তার পর?

—তারপরে সেই আঙার ঝড়ে-জলে ভেঙে পড়লো, ঝড়-ঝাপটায় কোথায় ছড়িয়ে গেল।

—এখন?

—এখন ও জায়গাটা একেবারে পরিষ্কার—যেমন দেখলেন!

যেমন দেখলাম!

নিজের মনে মনে বললাম—আমি তো বাপু গোটা গাছটাকেই দেখেছি! অথচ তার কথাও বিশ্বাস না করা শক্ত। লোকটা মিথ্যা বলতে যাবে কেন? এ মিথ্যা ব'লে তার লাভ কি? এখুনি তো অপরের মুখে প্রতিবাদ হবে।

যেমন দেখলাম! কি দেখলাম? কিন্তু নিজের জাগ্রত দৃষ্টিকেই

বা অবিশ্বাস করি কি ভাবে? নিশ্চয় দেখেছি তাতে কোন ভুল নেই। ভাবলাম একবার ফিরে গিয়ে দেখে আসি। কিন্তু ততক্ষণে গাড়ি অনেকটা পথ এসেছে, তাছাড়া লোকটাই বা কি ভাববে?

তবে—কি দেখলাম? ছায়া না মায়া না কি! কিন্তু কিছু যে তা নিশ্চয়। তখন মেসের সেই থিওজফিস্ট ভদ্রলোকের কথা মনে পড়লো। ভাবলাম গাছের ডালে মৃত্যুদৃশ্যের পুনরভিনয় যদি সম্ভব হয়, তবে মৃত গাছটির পুনরভিনয়ই বা কেন অসম্ভব? তা-ই কি? আমার অভিজ্ঞতা কে বিশ্বাস করবে? কিন্তু নিজে অবিশ্বাস করি কেমন ক'রে?

লোকটার কথা মনে পড়লো—'যেমন দেখলেন!' যেমন দেখলাম! কি দেখলাম মনের মধ্যে ক্রমাগত আলোড়ন করতে লাগলো, আর তার সঙ্গে তাল রেখে গাড়িখানা অন্ধকার পল্লীপথ দিয়ে এগিয়ে চলল—গ্রামের দিকে।

বিনা টিকিটের যাত্রী

ঠিক স্টেশনে ঢুকিবার মুখেই গাড়িখানা ছাড়িয়া গেল। এতক্ষণ ছুটিতেছিলাম এবার থামিলাম। চাকরের মাথায় বিছানা, সে তখনো ছুটিতেছে, বলিলাম, ওরে এবার থাম, আর ছুটে কি লাভ? এমন অদ্ভুত আদেশ সে শোনে নাই, সর্বদাই শুনিতেছে, 'ওরে আর একটু তাড়াতাড়ি', 'কেবলি ব'সে থাকে' ইত্যাদি। তার অভ্যাস অন্তরূপ হইয়া গিয়াছে, সে থামিল না, ছুটিতেই লাগিল। ভাবিলাম, ছুটুক, অভ্যাস খারাপ করিয়া কাজ নেই।

মফঃস্বলের ছোট স্টেশনে রাত্রিবেলা গাড়ি ফেল করিলে কি দুর্দশা হয় অভিজ্ঞতা ছাড়া বোঝা যাইবে না। তাহাতে আবার শীতের রাত্রি। গ্রীষ্মকাল হইলেও বা বাহিরে পায়চারি করিয়া কতকটা সময় কাটাইতে পারিতাম। চাকরটা একান্তে বিছানা রাখিয়া দাঁড়াইল। বলিলাম, গাড়ি ফেল হ'য়েছে, আমাকে আজ রাত্রে স্টেশনে থাকতে হবে।

সে অবাক্ হইল। তাহার সর্বশক্তিমান মনিবের জন্য গাড়ি একটু অপেক্ষা করিল না—এ কেমন কথা।

তাহাকে বলিলাম—তুই কি এই রাত্রেই বাড়ি ফিরে যাবি?

সে বলিল—আপনিও চলুন।

সর্বনাশ! অন্ধকারে আবার ৫।৬ মাইল পথ হাঁটিতে পারিব না, তার উপরে কাল ভোরের গাড়ি যে পুনরায় ফেল করিব না তাহার নিশ্চয়তা কি?

তাহাকে কিছু পয়সা দিলাম। বুঝিলাম, পয়সা ও সে এক সঙ্গে

বাড়ি পৌঁছিবে না; মাঝ পথে এক জায়গায় চোরাই মদের ভাঁটি আছে একটা সেখানে থাকিয়া যাইবে, দুইটাও থাকিয়া যাইতে পারে। চাকরটা বাড়ির উদ্দেশে অন্ধকারের মধ্যে মিলাইয়া গেল।

এবারে রাত্রি যাপনের উপায় আবিষ্কার করিতে উদ্যত হইলাম। এর মধ্যে আবার উপায়? স্টেশন বলিতে একখানা টিনের ঘর, তাহারি একটা দিক্ ঘিরিয়া লইয়া স্টেশনের কামরা। বাকি অংশটা সম্পূর্ণ খোলা, দেয়াল বলিতে কিছু নাই, অবশ্য কয়েকটা লোহার খুঁটি আছে, বেশ হাওয়া বাতাস খেলে। অন্ধকারের মধ্যে উত্তরের দিক হইতে স্বাস্থ্যকর হাওয়া আসিতেছিল—কিন্তু উপভোগ করিবার লোকের অভাব। স্টেশন ঘরে অবশ্য বাবুরা আছেন, কিন্তু তাঁহারা উত্তরের জানালা বন্ধ করিয়া দিয়াছেন, বুঝিলাম শীতের হাওয়ার তাঁহারা ভক্ত নহেন। আমারও প্রায় সেইরূপ মনোভাব—কিন্তু আজ নিরুপায়।

ডান দিকে কোণে ছোট একটি ঘর আছে বটে, সেখানে দরজার উপরে এক টুকরো কালো কাঠ আঁটাও রহিয়াছে, খুব সম্ভব তাহার গায়ে "Waiting Room" কথাটিও লিখিত আছে। কিন্তু হইলে কি হয়—আজ ওখানে কয়েক মাস যাবৎ মালবাবু সপরিবারে আশ্রয় লইয়াছেন, তাঁহার সরকারী টিনের ঘর ঝড়ে উড়িয়া গিয়াছে। কাজেই ওদিকটায় ঘেঁষিয়া লাভ নাই। অগত্যা বামদিকেই অর্থাৎ স্টেশনের কামরার মধ্যে ঢুকিলাম। স্টেশনের ঘড়িটার কাঁটা কুড়িটার কাছে। মাঝখানে একখানা বড় টেবিল, বেশ প্রশস্ত, তার উপরে এক রাশ খাতাপত্তর, দোয়াত কলম, টেলিফোনের ষ্ট্যাণ্ড, গোটা দুই চায়ের পেয়ালা—খুব সম্ভব শেষোক্ত জিনিষগুলি সরকারী সম্পত্তি নয়। টেবিলের উপর একজন বাবু (গায়ে সরকারী কোর্তা দেখিয়া বুঝিলাম স্টেশনের কর্মচারী) জড়ো সড়ো হইয়া শায়িত। এতক্ষণে বোঝা

গেল, প্রশস্ত টেবিলের উপকারিতা কোথায়। আর একজন বাবু সরকারী কোর্তা গায়ে দিয়া হাত লণ্ঠনের আলোতে কতকগুলি টিকিট মিলাইয়া লইতেছেন, যে-ট্রেনখানা আর একটু আগে আসিলেই পাইতাম, লুচির সঙ্গে আলুর দম খাইতে গিয়াই এই বিপদ, তাহারই যাত্রীদের টিকিট।

বাবুটির মনোযোগ আকর্ষণের আশায় কাশিলাম, মেজেতে জুতার শব্দ করিলাম, কয়টা বাজিয়াছে স্পষ্ট দেখিয়াও ক'টা বাজে জিজ্ঞাসা করিলাম—কিন্তু স্টেশনের বাবুদের অসীম মুমুক্ষা, তাঁহারা জানেন সকলের সব কথার উত্তর দিতে গেলে সংসার চলে না। এবারে দু'টি বিড়ি বাহির করিয়া একটি তাঁহার দিকে অগ্রসর করিয়া দিলাম। তাঁহার সাধনায় ফাঁক ছিল। টুক করিয়া বিড়িটা লইয়া যেমন কাজ করিতেছিলেন, তেমনি করিয়া চলিলেন। না, মাঝখানে একবার পকেট হইতে দেশলাই বাহির করিয়া বিড়ি ধরাইয়াছিলেন। দেশলাই আমার পকেটেও ছিল, কিন্তু, আমার যে তাঁহার দেশলাই উপলক্ষ্যে তাঁহার মনোযোগটা চাই, বলিলাম, দেশলাইটা—এসব বাক্য শেষ করিবার প্রয়োজন হয় না; এক্ষেত্রে তিনি শেষ করিবার সুযোগও দিলেন না, ইঙ্গিতে লণ্ঠনটা দেখাইয়া দিলেন। সরকারী লণ্ঠনটা খুলিবার কৌশল না জানায় নিজের দেশলাই দিয়াই বিড়ি ধরাইলাম।

ঠনক, ঠনক।

আপ, ডাউন দুটো কালো বাক্স স্টেশনে থাকে, কি নাম জানি না। একটা ঠনক ঠনক করিয়া বাজিয়া উঠিল।

এবারে বাবু মুখ তুলিয়া কালো বাক্সটার নিকটে গিয়া টেলিফোন কানে তুলিলেন।

—কে, সুরেন নাকি?...হাঁ, আমি প্রবোধ। বেশ। বেশ।

কাল দুপুর নাগাদ যাবো। আরে বল কি? তোমার ছেলের অন্নপ্রাশন —আর যাবো না। নিশ্চয় যাবো, দুপুরের একটা মাল গাড়িতে যাবো। না, না, চিন্তা ক'রো না।

এগুলো বোধ করি সরকারী সংবাদ নয়। নাই হোক, সরকারী কলে বে-সরকারী কথা বলিতে বাধা নাই।

বুঝিতে পারিলাম, আপ ডাউন কোন দিকের স্টেশনে এক বাবুর পুত্রের অন্নপ্রাশন। আনন্দের সংবাদ।

বাবুকে খুশী করিবার উদ্দেশ্যে বলিলাম, উনি বুঝি আপনার আত্মীয়?

বাবুর ঠোঁট দু'টি একটু নড়িল, বুঝিলাম কিছু বলিলেন। শুনিতে পাই আর না পাই তাতে কি? আমার উদ্দেশ্যে কথিত তো। একি আমার কম আনন্দ!

—আর একটা বিড়ি ইচ্ছা করুন।

—দিন।

এবারে স্পষ্ট শুনিতে পাইয়াছি।

—বসুন না।

আহা, এতক্ষণে একটা গতি হইল। স্টেশনের মানুষ হইলেও অমানুষ নন, আমিই এতক্ষণ ভুল বুঝিতেছিলাম।

একখানা চেয়ারের ওপর এক গাদা খাতা ছিল, নামাইবার উদ্যম করিতেই বলিলেন, নামবেন না, ছারপোকা আছে।

—কিন্তু খাতাগুলো কি নষ্ট হবে না?

—নষ্ট হবে কেন? ওগুলো তো এজন্যেই আছে।

তা বটে, আমরা বাহিরের লোকে কেমন করিয়া জানিব কার কি প্রকৃত ব্যবহার!

বাবুটি বলিলেন—কোথায় যাবেন ?

—আজ্ঞে, কল্‌কাতা।

—এত আগে কেন ? কাল সেই ভোরে গাড়ি ?

বলিতে পারিতাম যে, এত পরে কেন ? কিন্তু কিছু না বলিয়া বোকা সাজিয়া রহিলাম, হয়তো তাহাতেই দয়ার উদ্রেক হইবার সম্ভাবনা।

—রাতে থাকবেন কোথায় ?

—এখানেই কোথাও।

—আর কোথায়! ওখানেই আজ আপনাকে রাত কাটাতে হবে। ভালো ক'রে বসুন।

বিড়ির অসীম শক্তি। নামটাও মোহিনী বিড়ি কিনা ?

কিছু কথা বলা দরকার, চুপ করিয়া থাকা চলে না, নতুবা চেয়ারে বসিবার অধিকার হারাইতে কতক্ষণ!

—এগুলো টিকিট বুঝি ? লেশমাত্র সন্দেহ ছিল না, তবু দেখি ঐ প্রশ্নের সূত্রে যদি কথার সূত্রপাত হয়!

—আর বলেন কেন ?

টিকিটগুলা সূতা দিয়া জড়াইতে আরম্ভ করিলেন—আজ এক বেটা ট্রেন থেকে নেমে টিকিট না দিয়ে অন্ধকারের মধ্যে গা ঢাকা দিচ্ছিল।

গা ঢাকা দিবার উদ্দেশ্য থাকিলে অন্ধকারই প্রশস্ত, এতে বিস্মিত হইলে চলিবে কেন ?

—তার পরে ?

—আমার কাছে চালাকি নয়। দেখি যে লোকটা প্লাটফর্ম পেরিয়ে বাইরে চলে যাচ্ছে, অমনি দৌড়লাম, লোকটাও দৌড়ল—(আশ্চর্য)।

—গিয়ে ধরলাম—ঐ বাদামতলায়, সেখানে যেমন অন্ধকার, তেমনি জঙ্গল!...হাঁ, আদায় করে নিলাম।

ঐ আদায়টুকু সরকারী তহবিলে গেল না বে-সরকারী পকেটে ঢুকিল এসব প্রশ্ন প্রাসঙ্গিক হইলেও তুলিতে নাই। বলিলাম, আপনার কাছে পারবে কেন, আপনি যে রকম স্মার্ট!

—আপনি বুঝছেন দেখছি। আর বুঝবেন নাই বা কেন, হাজার হোক—

হাজার হোক কি তা আমিই জানিনা, উনিই বা জানিবেন কিরূপে?

—আর একটা বিড়ি আছে নাকি?

বিড়ি হস্তান্তরিত হইল।

—নিন, আরাম করে টানুন। সারাটা রাত কাটাতে হবে।

—বেশ বিড়ি!

মোহিনী বিড়ি। 'কি মোহিনী জানো বন্ধু কি মোহিনী জানো।'

—ঠনক, ঠনক!

—নাঃ বিরক্ত ক'রে মারলে।

বাবুটি উঠিলেন। এবারে আর সামাজিক নিমন্ত্রণ নয়, মাল গাড়ীর আগমন সংবাদ।

রামশরণ! এই রামশরণ!

টেবিলের তলের একটা পুঁটুলি নড়িয়া উঠিল।

বাবু পা দিয়া ঠেলা দিলেন। সর্বাঙ্গে কম্বল জড়াইয়া যে লোকটা টেবিলের তলা হইতে বাহির হইল—তাহারই নাম তবে রামশরণ।

বাবুটি রাষ্ট্র ভাষায় যাহা বলিলেন তাহার মর্ম—মালগাড়ী আসছে, ডাউন দে গিয়ে।

নিদ্রাজড়িত চোখে রামশরণ বাহির হইয়া গেল। আজ মালগাড়ীর একটা ফাঁড়া আছে বুঝিতে পারিলাম।

কিছুক্ষণ পরে অন্ধকারকে মথিত করিয়া একটা শব্দের ঝড় বহিয়া গেল।

উঠিয়া গিয়া জানলার কাছে দাঁড়াইলাম, বাহিরে অন্ধকার, নিরেট ঘন কালো, আকাশের তারাটিও দৃশ্যমান নয়, যেন সুগভীর কয়লা খাদের মধ্যে নামিয়া পড়িয়াছি। জানালার কাঁচ ভেদ করিয়া কন্‌কনে ঠাণ্ডা, আকাশের তলে না জানি আরও কত। আজ খোলা চালার মধ্যে থাকিলে শিক্ষাই হইত বটে। পাছে চেয়ারখানা হারাই তাড়াতাড়ি ফিরিয়া আসিয়া চাপিয়া বসিলাম।

—এই ওঠ্ ওঠ্, মাস্টারবাবু আসছেন।

—ঘুমোতে দিল না দেখছি, বলিয়া গভীর নিদ্রা ত্যাগ করিয়া টেবিলে শায়িত লোকটি উঠিয়া বসিলেন।

— কি হ'য়েছে?

—মাস্টারবাবু আসছেন।

এমন সময়ে পায়ে ভারি জুতার শব্দ তুলিয়া, হাতে একটা লণ্ঠন দোলাইতে দোলাতেই, মাথায় মুখে আগাগোড়া আলোয়ান জড়াইয়া মাস্টারবাবু ঢুকিলেন। মাস্টারবাবুর প্রকাশ্য অংশ নাকের দুটি ফুটো এবং চোখের দুটি ফুটো।

—আঃ কি শীত পড়েছে, তবু তো সবে কার্তিক মাস!

হাতের লণ্ঠন মেজেতে রাখিয়া মুখের আলোয়ান সরাইলেন, একজোড়া কাঁচা পাকা মলোটভি গোঁফ বাহির হইয়া পড়িল।

এবার বুঝি আমাকে চেয়ারখানি ছাড়িতে হয়। না, তিনি অন্য একখানি চেয়ারে বসিলেন। একটা মোহিনী বিড়ি দেব নাকি? তাঁহার মর্জির ব্যতিক্রম হইলে শীতের রাত্রি বাহিরে কাটাইবার আশঙ্কা।

প্রবোধবাবু, সেই যিনি মোহিনী বিড়ির গুণে মুগ্ধ, আমার কাছে

একটি বিড়ি চাহিয়া লইয়া মাস্টারবাবুর দিকে আগাইয়া দিলেন, বলিলেন, স্যার আজ একটা প্যাসেঞ্জার ভারি মুস্কিলে ফেলেছিল!

—শুনেছি, শুনেছি, ওহে ছোকরা কাজটা ভালো করনি।

মাস্টারবাবু বিড়িটা টেবিলের উপর রাখিয়া দিলেন।

প্রবোধ অবাক, ভাবিয়াছিল কর্তব্যনিষ্ঠার জন্য প্রশংসা পাইবে।

—আজকাল W. T. ধরবার জন্য প্রেশার দিচ্ছে।

—কিন্তু ঐ করতে গিয়ে বিপদে পড়লে কে ঠেকাবে শুনি?

সদ্য নিদ্রোত্থিত বলিলেন—হ্যাঁ, যাত্রীরা আজকাল অনেক সময়ে মারপিঠ করে।

—তবেই বুঝেছ।

—আর কি বিপদ হ'তে পারে?

—ঐ জঙ্গলের দিকে গিয়েছিল তো?

—সাপখোপ হবে।

—শীতকালে সাপখোপ কোথায়?

—তোমরা কেবল সাপ আর উপরি-অলা দেখ্‌ছ। কিন্তু মনে রেখো যে উপরি-অলারও বাবা আছে! যেটুকু রয়সয় করো, রাত-বিরেতে প্যাসেঞ্জারের পিছনে পিছনে তোমার অন্ধকারে যাবার দরকার কি শুনি? প্রোমোশন হবে? প্রাণটা গেলে প্রোমোশন পাবে কে ভেবে দেখেছ?

একটু থামিয়া—

—আরে বাপু প্লাটফর্ম অবধি তোমার জুরিসডিক্‌শন। তার মধ্যে ধরতে পারলে ভালো—আবার বাইরে যাওয়া কেন? বয়স অল্প কিনা! তায় আবার নূতন চাকরি, উৎসাহ বেশী। দাও—

বিড়ি না দেশলাই?

দেশলাইটাই বটে। বিড়ি ধরাইয়া টানিতে লাগিলেন। মাস্টারবাবুর বাঁ গালে মস্ত একটা আঁচিল—এতক্ষণ অন্ধকারে দেখিতে পাই নাই, দেশলাই কাঠির আলোতে চোখে পড়িল।

নাঃ, মোহিনী বিড়ির গুণ আছে। মাস্টারবাবুর মুখে এতক্ষণ পরে কতকটা মানবিক ভাব দেখা দিয়াছে।

—আপনি বুঝি ট্রেন ফেল করেছেন?

কৃতার্থ হইয়া বলিলাম, আজ্ঞে হাঁ।

—আজ তবে ওখানে ব'সেই রাত কাটাতে হবে দেখছি।

যদি না বাহির করিয়া দেন।

—শুনুন মশাই, শুনুন। আপনার বয়স হ'য়েছে বুঝ্‌তে পারবেন—এরা সব ছেলেছোকরা, আমাদের মতো বুড়োর কথা বিশ্বাস করে না।

ভাবিলাম, আমাদের বলিতে আমিও নাকি? বুঝিলাম রাত্রি জাগরণের আশঙ্কায় নিশ্চয় মুখটা অনেকখানি শুকাইয়া গিয়াছে, নতুবা বুড়োর দলে পড়িবার গৌরব এখনও তো অর্জন করিতে পারি নাই।

—তখন কেবল সার্ভিসে ঢুকেছি 'রিলিংভিং হ্যাণ্ড,' আজ এ স্টেশনে, কাল ও স্টেশনে এমনি ছুটে বেড়াতে হয়। সেদিন গিয়েছি, না, স্টেশনের নামটা নাই বল্‌লাম, কে আবার কি ভাববে? এমনি শীতকাল, না শীত আরও একটু বেশি হবে, তারিখটা কিনা ছিল পয়লা ডিসেম্বর—

মাস্টারবাবু শুনিতে পান এমন অস্ফুট স্বরে প্রবোধ অপর জনের উদ্দেশ্যে বলিল—কি মেমরি!

মাস্টারবাবু প্রশংসাটুকু গ্রহণ করিলেন কিন্তু মূল্য দিলেন না, শুনিতে পান নাই এমনভাবে আমার উদ্দেশে বলিলেন, নিন ভালো ক'রে বসুন, আপনার তো তাড়া নেই গল্পটাও ছোট নয়।

আমি আলোয়ানখানা ভালো করিয়া জড়াইয়া লইয়া বসিলাম, মাস্টারবাবু আরম্ভ করিলেন—

সেদিন সকালেই পৌঁছেছি সেই নূতন স্টেশনে, পৌঁছেই বর্ধমান লোকালের দুই W. T.-কে ধরে' ফেলেছি, পিছন দিক দিয়ে গুড় গুড় ক'রে পালাবার চেষ্টায় ছিল। আমি গিয়ে খপ ক'রে দু'জনের হাত ধরে' ফেলেছি, তারা পালাবার জন্য টানাটানি সুরু করলো! তারা দু'জন আমি একা। কিন্তু পারবে কেন? তখন আমি ইয়ংম্যান, যেমনি স্মার্ট তেমনি গায়ে শক্তি রাখি। একা তাদের টেনে নিয়ে স্টেশন ঘরে এলাম। মাস্টারবাবু বললেন—হ্যাঁ বাহাদুর ছোকরা বটে! W. T.-র আমি ছিলাম যম! ওর আগে ছিলাম রিষড়েয়—ছ' মাসে প্রায় আড়াই শ W. T. ধরেছিলাম। মাস্টারবাবু প্রোমোশনের জন্য আমাকে Recommend করেছিলেন। তিনি বলতেন, নাঃ এ ছেলেকে কেউ আটকাতে পারবে না, D. T. S. হয়ে তবে ছাড়বে।

এবারে আমার মুখের দিকে তাকাইলেন, বলিলেন, ভাবছেন তবে আজ আমার এ দশা কেন? সেই কথাই তো বল্‌তে যাচ্ছি।

এই বলিয়া নিভন্ত বিড়িটায় কষিয়া কয়েক টান দিয়া ফেলিয়া দিলেন। ঘড়িটার দিকে তাকাইয়া দেখি দুটা কাঁটা চব্বিশটার কাছে গিয়া মিলিয়াছে। বাহিরে অন্ধকারে শীতের মধ্যে ঝিঁঝির একটানা আওয়াজে রাত্রির নিস্তব্ধতা ঝিম ঝিম করিতেছে—পৃথিবীতে আর যেন কোন শব্দ নাই। ঘরের মধ্যে মৃদু আলোয় আমরা চারটি প্রাণী চারটি ছায়া লইয়া নীরবে বসিয়া আছি। মাস্টারবাবু বলিতেছেন—

—সেদিন এক কাণ্ড ঘট্‌লো যার ফলে W. T. ধরা ছেড়ে দিলাম, সেই সঙ্গে আমার প্রোমোশনের আশাও চিরকালের মতো গেল—এখন

দেখুন বুড়ো বয়সে……কোথায় D. T. S. আর কোথায় এই সি ক্লাস স্টেশনের স্টেশন মাস্টার।

প্রবোধ সহানুভূতিসূচক একটি দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিল।

—তখন বোধ করি রাত আটটা হবে, তার বেশি তো নয়ই। কিন্তু শীতের রাত নিঝুম হ'য়ে এসেছে, তার উপরে কৃষ্ণপক্ষের অন্ধকার। ছোট স্টেশন ইতিমধ্যেই ছম্ ছম্ করছে। বাসায় গিয়েছিলাম এক কাপ চা খেতে। ফিরে এসে দেখি যে আপ বর্ধমান লোকাল এসে থেমেছে। কয়েকজন যাত্রী নামলো, টিকিট দিয়ে বেরিয়ে গেলো। স্টেশন ঘরে ফিরবো এমন সময় দেখি কিনা যে একজন যাত্রী অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে প্লাটফর্মের আপে চলেছে। ও মশাই টিকিট দিয়ে যান, টিকিট দিয়ে যান। নাঃ কথা কানেই তোলে না। এর মধ্যে গাড়ী ছেড়ে চলে গেল। আমি পিছন পিছন ছুটলাম, থামুন, থামুন, টিকিট কোথায়? কে কার কথা শোনে? সে সোজা হেঁটে হন হন ক'রে চলেছে। বুঝলাম W. T. না হ'য়ে যায় না। এমন বেয়াড়া যাত্রীও দেখিনি। আমাদের মধ্যে বোধকরি দশ গজের তফাৎ। লোকটা প্লাটফর্ম পেরিয়ে গিয়ে মাটিতে নামলো, জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে পালাবে মৎলব। বলতে ভুলে গেছি লোকটার হাতে ছিল একটা পুঁটুলি। আমিও প্লাটফর্ম ছাড়িয়ে মাটিতে নামলাম। ভাবলাম গা ঢাকা দেবার জায়গা বটে, এক অন্ধকার তাতে এক বুক আগাছা, মাঝখানে ঘুরঘুট্টি পাকিয়ে মস্ত এক কাঁঠাল গাছ।

—লোকটা পালালো নাকি? এদিকে ওদিকে খুঁজছি, কোথাও নেই, ডাকাডাকি করছি, এমন সময়ে দেখি সেই পুঁটুলি, ঠিক কাঁঠাল গাছটার নীচেই। তবে পালায়নি, কাছেই কোথাও আছে। কিন্তু গেল কোথায়? এমন সময়ে মাথা তুলে দেখি কাঁঠাল গাছের ডালের

উপরে বসে, অন্ধকারেও ভুল করিনি, সেই লোকটা ! আমাকে দেখেই হি হি করে হেসে উঠল ! সর্বাঙ্গ জ্বলে উঠ্‌ল ! নেমে আসুন, এখনি নামুন ! আপনাকে চালান না দিয়ে ছাড়ছিনে।

আবার সঙ্গে সঙ্গে সেই হি হি হাসি। ভাবছি গাছে উঠ্‌বো না কি ? এমন সময়ে শুনতে পেলাম, আমাদের পয়েন্টস্‌ম্যান কিষণলাল চীৎকার করছে—বাবু ঘুমকে আইয়ে, উধার মৎ যাইয়ে। বুঝ্‌লাম বেটাকে দু'চার আনা দিয়ে বশ করেছে !

এবারে মাস্টারবাবুর আওয়াজ পেলাম—ওহে ছোকরা ফেরো, ফেরো। তাকিয়ে দেখছি লণ্ঠন নিয়ে মাস্টারবাবু আর কিষণলাল হন্ হন্ করে আসছেন !

—ওদিকে গাছের ওপরে সেই হি হি ! এখন গা শিউরে উঠ্‌ছে তখন গা জ্বলে যাচ্ছিল। ভাবলাম ওরা আসবার আগেই লোকটাকে ধরতে হবে, কিন্তু তাকিয়ে দেখি লোকটাও নেই হাসিও থেমেছে। আবার পালিয়েছে।

—ইতিমধ্যে কিষণলাল এসে আমাকে জড়িয়ে ধরলো, বললো, বাবু জিউ নিকল জায়েগা !

—প্রাণে মরবে নাকি ছোকরা !

কিষণলাল হিড়্ হিড়্ করে আমাকে টেনে নিয়ে স্টেশন ঘরে ফিরলো সঙ্গে মাস্টারবাবুও ফিরলেন।

—মাস্টারবাবু বললেন, ছোকরা, আর একটু হ'লে প্রাণে মরতে যে!

—কেন, একথা বলছেন কেন ? ঐ সব পাজি W. T-কে শাসন না করলে—মাস্টারবাবু থামিয়ে দিয়ে বললেন, বসো বসো সব বলছি। যা কিষণলাল বাবুর জন্যে এক কাপ চা নিয়ে আয় !

—তারপর গলা খাটো করে বললেন, কাকে ধরতে গিয়েছিলে? ও কি মানুষ?

—মানুষ নয়। তবে কি?

—ঐ যা হয়, রাতের বেলায় নামটা আর নাই করলাম।

—কি বলছেন আপনি?

—মাস্টারবাবু বললেন, আজ যে ১লা ডিসেম্বর তা মনে ছিল না, নইলে তুমি newhand তোমাকে মনে করিয়ে দিতাম। প্রত্যেক বছর ১লা ডিসেম্বর ঐরকম দেখা যায়।

—কেন ১লা ডিসেম্বর কেন?

—শোনা যায় যে, লোকটা ছিল কোন সদাগরী আপিসের কেরাণী। এখান থেকে ডেলি প্যাসেঞ্জারী করতো। এক বছর ১লা ডিসেম্বর আপিসের সাহেব তাকে বরখাস্ত করে—সে পুঁটুলি হাতে করে ট্রেন থেকে নেমে ওখানে পুঁটুলি রেখে গাছের ডালে গলায় দড়ি দিয়ে মরে।

—তবে কি ও মানুষ নয়?

—এতক্ষণে বুঝলে নাকি?

—এতক্ষণেই বুঝলাম, কারণ এবারে এইমাত্র গায়ের লোম কাঁটা দিয়ে উঠল, আরও একটু পরে বুঝলাম গলার কলার ভিজে উঠেছে। কিষণলাল চা নিয়ে এলো।

এবারে চটকা ভাঙ্গিয়া উঠিয়া মাস্টারবাবু আমাকে বলিলেন, এবারে বুঝতে পারছেন কেন ১লা ডিসেম্বর তারিখটা মনে আছে। সেই থেকে মশাই W. T. ধরবার অভ্যাস ছেড়ে দিলাম। রাত্রি তো দূরের কথা দিনের বেলাতেও আর চেষ্টা করিনে। টিকিট দিল ভালো না দিলে কি করবো। প্রমোশনের জন্য প্রাণটা কে দেবে মশাই।

কিছুক্ষণ সবাই চুপ। তারপরে তিনি প্রবোধবাবুর উদ্দেশ্যে

বলিলেন—তাই বলছি, যতটা রয়সয় করবে, বাড়াবাড়ি কিছু নয়। আজ অন্ধকারে পিছন পিছন বাদামতলা পর্যন্ত গিয়ে ভালো করনি।

আড়চোখে দেখিলাম প্রবোধবাবু ও তাহার বন্ধুর মুখে আতঙ্ক ও অবিশ্বাসের ছায়া মিলিতভাবে পড়িয়াছে।

চারজনেই নীরব। কতক্ষণ এইভাবে কাটিত জানি না—এমন সময়ে ঠনক ঠনক করিয়া ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল। প্রবোধবাবু টেলিফোনে কথা বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন—রামশরণ—টুয়েলভ আপ সিগন্যাল দে।

এতক্ষণ পরে আমরা পুনরায় বাস্তবজগতে ফিরিয়া আসিলাম।

আয়নাতে

. বহুদিন পরে অরুণের চিঠি পাইলাম। এম-এ পাশ করিবার পরে রংপুর জেলায় তাহার বাড়ীতে সে চলিয়া যায়—তারপর হইতে আর দেখা হয় নাই, লোকমুখে মাঝে মাঝে তাহার সংবাদ পাইতাম বটে—চিঠি পাইলাম এই প্রথম। এম-এ পাশ করিবার পর প্রায় দশ বৎসর অতীত হইয়াছে। অরুণের সঙ্গে বাল্যকাল হইতে পড়িয়াছি, সে কেবল সহপাঠী মাত্র ছিল না, কলেজে পড়ার সময়ে আমাদের দুইজনের মধ্যে বিশেষ ঘনিষ্ঠতাও হইয়াছিল। তারপরে ছাড়াছাড়ি হইয়া যায়। তাহার সাংসারিক অবস্থা আমার অজ্ঞাত ছিল না; জানিতাম যে সে জমিদারপুত্র, তাহাদের অবস্থা বেশ সচ্ছল। আমি এখন ইস্কুল মাষ্টারি করি।

কিন্তু পাঠ্যজীবনের বন্ধুত্ব প্রায়ই কর্মজীবনের প্রবাহে ছিন্ন হইয়া যায়—তাই অরুণের নীরবতাকে সংসারের অনিবার্য নিয়ম বলিয়াই গ্রহণ করিয়াছিলাম—এমন সময়ে অপ্রত্যাশিতরূপে তাহার পত্র আসিল।

অরুণ পুরানোদিনের স্মৃতি জাগ্রত করিয়া দিয়া আসন্ন বড়দিনের ছুটিতে আমাকে তাহাদের বাড়ী যাইতে বিশেষ অনুরোধ করিয়াছে লিখিয়াছে যে, কলিকাতার জীবনে তুমি অভ্যস্ত এখানে পাড়াগাঁয়ে আসিলে তোমার নিশ্চয় খুব ভালো লাগিবে।

কথাটা মিথ্যা নয়, পাড়াগাঁয়ের প্রতি নিষিদ্ধ ফলের ন্যায় একটা আকর্ষণ আমার আছে।

সে আরও লিখিয়াছে যে, তোমাকে পাড়াগাঁয়েই কাটাইতে হইবে না, ভ্রমণের প্রচুর অবকাশও পাইবে। সে জানাইয়াছে যে, জলপাইগুড়ি জেলায় সে একটি চা-বাগান কিনিয়াছে, আমি পৌঁছিলে আমাকে লইয়া সেখানে বেড়াইতে যাইবে। অরুণের চিঠিতে আছে —"ভাবিওনা যে চা-বাগানের কাঠের ঘরে তোমাকে রাত্রিযাপন করিতে হইবে—এখানে একটি প্রকাণ্ড পুরাতন বাড়ীও ছিল, সেটাও কিনিয়াছি। কাজেই তুমি আরামেই কাটাইতে পারিবে। বাঘ-ভালুকের ভয়ে রাত্রি জাগরণ করিতে হইবে না।

সে-অঞ্চলের দৃশ্যের মনোরমতা উল্লেখ করিয়া নদী, পাহাড়, বন-জঙ্গল প্রভৃতির লোভ দেখাইয়াছে, বলিয়াছে এমন সুন্দর দৃশ্য অন্যত্র দেখিতে পাইবে না।

নাঃ যাইতেই হইল দেখিতেছি। এতখানি লোভ সংবরণ করিবার কোন হেতু নাই। পাকাবাড়ীর ছাদে নিরাপদে বসিয়া পাহাড়, বন-জঙ্গল দেখিবার লোভ সংবরণ করা সত্যই কঠিন। বিশেষ অরুণের প্রতি চিরকালই আমার একটা আকর্ষণের মতো ছিল—সেটাও অন্যতম কারণ, প্রাকৃতিক দৃশ্যের চেয়েও গভীরতর আকর্ষণ। অতএব বড়দিনের ছুটিতে যাওয়াই স্থির করিলাম এবং পত্রযোগে সে কথা অরুণকে জানাইয়া দিলাম।

যথা সময়ে রংপুর জেলায় উপস্থিত হইলাম, অরুণ গাড়ী লইয়া স্টেশনে উপস্থিত ছিল। অরুণ বলিল—এসো সোজা গাড়ীতে চড়া যাক—৫।৬ মাইল পথ যেতে হবে।

কাঁচাপথে টমটম গাড়ী ছুটিতে লাগিল, এবারে দু'জনে কথাবার্তা বলিবার সুযোগ পাইলাম।

অরুণ বলিল—তুমি আসাতে কত যে খুশী হয়েছি বলতে পারিনে।

খুশী অবশ্যই সে হইয়াছে নতুবা কাঁচাপথে শেষরাত্রে স্টেশনে আসিত না।

সে বলিল—তোমার কি শরীর খারাপ? এত রোগা হয়ে গিয়েছ কেন?

বলিলাম, অনেকভাবে ওর উত্তর দেওয়া যায়, কিন্তু সবচেয়ে প্রাঞ্জল উত্তর এই যে, ইস্কুলমাস্টারি করি।

সে হাসিল, বোধকরি মনের ব্যথাকে চাপা দিবার উদ্দেশ্যেই, বলিল, এযাত্রা ক'দিন থেকে যাও, তারপর মাঝে মাঝে এসো, শরীর সারবে।

অরুণের চেহারায় বড় পরিবর্তন ঘটে নাই, শুধু স্বাস্থ্যের রং লাগিয়াছে, বুঝিলাম স্বাস্থ্যের মূলে আছে সচ্ছলতা।

তারপরে চলিতে চলিতে অনেক কথা হইল, প্রথমেই সে আমার স্ত্রী পুত্র কন্যার নামগুলি সংগ্রহ করিয়া লইল। সে এখনো বিবাহ করে নাই, আমি অনেকদিন করিয়াছি, ইস্কুলমাস্টার বিবাহের চেয়ে গুরুতর আর কীই বা করিতে পারে।

দু'দিকে ধান-কাটা, শিশির-পড়া সবুজ মাঠ। অরুণের লিখিত পাহাড় দেখিবার আশায় এদিক-ওদিক চাহিলাম—।

অরুণ আমার ভাব বুঝিতে পারিয়া বলিল—ঐ দিকটায় গারো পাহাড়।

অন্য দিকের সহিত সেদিকের প্রভেদ বুঝিলাম না, তবু বলিলাম—ওঃ অর্থাৎ দেখিতে পাই আর না পাই—অতবড় সত্যটাকে অস্বীকার করি কি প্রকারে?

ধরলা নদীর তীরে কচুয়া গ্রামে অরুণদের বাড়ী। ঘণ্টা দেড়-দুই সময়ের মধ্যে সেখানে পৌঁছিলাম। আদর আপ্যায়নের অভাব হইল না যেহেতু অরুণ নিজে উপস্থিত, আবার বাড়াবাড়িও হইল না যেহেতু

মা-মাসির দলের অভাব। অরুণ সংসারে একাকী, একদিকে এখনো বিবাহ করে নাই, অন্যদিকে পিতা-মাতা অনেকদিন গত হইয়াছে।

তাহার বাড়ীঘর ও সাংসারিক অবস্থা সম্বন্ধে আগে যেমন কল্পনা করিয়াছিলাম, দেখিলাম তাহার চেয়ে অনেক ভালো, ইস্কুলমাস্টারের কল্পনা তো, ভরসা করিয়া বেশীদূর অগ্রসর হইতে পারে না।

বিকাল বেলা অরুণ বলিল—সুবোধ তোমাকে এখানে রাখবার জন্যে আনিনি, কাল আমাদের রওনা হ'তে হবে।

অবশ্যই হইবে, তবু অত নির্বিকার হইলে চলে না, শুধাইলাম, কোথায় ?

—সেই যে চা-বাগানের কথা লিখেছিলাম।

—ওঃ

—সেখানে পাহাড়, বন-জঙ্গল সমস্তই পাবে।

আরো কিছু পাবো তো ?—অর্থাৎ বাসস্থান, আহার্য ইত্যাদি ! অরুণ যখন সঙ্গে থাকিবে ওসব চিন্তা ও অবশ্য করিয়াছে।

অরুণ বলিল,—এস্টেটের মধ্যে প্রকাণ্ড একটা বাড়ী আছে, সাধারণতঃ চা-বাগানে যেমন বাড়ী হয়—মোটেই তেমন নয়।

কি বলা উচিত ভাবিতেছি।

অরুণ বলিল—ও বাগান আর বাড়ী দুই-ই ছিল এক সাহেবের। সে হঠাৎ, না, বিলেত চলে গেলে, আমরা সস্তায় সব কিনে নিয়েছি।

অরুণের সস্তা আর ইস্কুলমাস্টারের সস্তা খুবসম্ভব কাছাকাছি নয়, তাই অঙ্কটার পরিমাণ আর জানিতে চাহিলাম না।

অরুণ বলিল—এখন ওখানে চমৎকার স্বাস্থ্য। আর নানা রকম বুনো পাখী পাওয়া যায়, কত খাবে ? এর পরের বার তোমার ছেলে-মেয়েদের এনো।

এক একজন লোকের স্বভাব পরের ভালো করিতে পারিলে আনন্দ পায়—অরুণ সেই জাতের।

—তবে কালই যাত্রা করা ঠিক? কি বলো?

আমি বলিলাম, আমি তো কল্‌কাতা থেকেই যাত্রা ক'রে বেরিয়েছি—আমার আবার কিসে আপত্তি?

পরদিন যাত্রার ব্যবস্থা করিবার উদ্দেশ্যে অরুণ প্রস্থান করিল।

অরুণ মিথ্যা বলে নাই, এখানকার প্রাকৃতিক দৃশ্য সত্যই অতুলনীয়। মনোরম প্রাকৃতিক দৃশ্যে যাহারা অভ্যস্ত তাহাদের কেমন লাগিবে জানি না, কিন্তু বাংলা দেশের সমতল দৃশ্য-দেখা চোখের তৃষ্ণা আর মিটিতে চাহে না। অদূরে জয়ন্তিয়া পাহাড়ের সারি উঁচুনীচু হইয়া ধূসর দিগন্তের শেষসীমা পর্যন্ত প্রসারিত, আর ঐ পাহাড়ের পাদদেশ হইতে যেখানে দাঁড়াইয়া আছি উঁচু-নীচু শ্যামল মাঠ, নিকটেই একটা ছোট্ট পাহাড়ে নদী, এত ছোট যে, নামকরণের কষ্টস্বীকার কেহ করে নাই। এই মাঠের অনেকখানি জায়গা অরুণের চা-বাগান। এক সময়ে বাগান ছিল বটে, কিন্তু এখন সম্পূর্ণ জঙ্গলা অবস্থায় পড়িয়া আছে। মাঝখানে একটি পুরাতন প্রকাণ্ড বাড়ী, প্রাসাদ বলিলেও হয়, কেল্লা বলিলেও ক্ষতি নাই। এত বড় বাড়ী এখানে কে তৈয়ারী করিল, কেন তৈয়ারী করিল—অদ্ভুত!

বাড়ী যে-ই তৈয়ারী করুক তাহার সখ ও রুচি দুই-ই ছিল। সভ্যতার এই প্রান্তে নির্মিত বাড়ীটিতে আরামের কোন ব্যবস্থারই ত্রুটি ছিল না। ছিল না বলাই উচিত, কারণ এখন অনেকদিন অব্যবহৃত পড়িয়া থাকায় জীর্ণ হইয়া আসিয়াছে। অরুণ বলিয়াছিল যে, কোন

এক সাহেব চা-কর বাগানের মধ্যে বাড়ীটি তৈয়ারী করিয়াছিল—তার পরে সস্তায় বিক্রয় করিয়া দিয়া বিলাতে চলিয়া গিয়াছে।

অরুণ বলিল,—সুবোধ, আজ সন্ধ্যা হ'য়ে এসেছে, তার উপরে আবার দুজনেই পথের কষ্টে ক্লান্ত, আজ বিশ্রাম করা যাক,—কাল তোমাকে নিয়ে বের হবো, ঐ পাহাড়টার কাছে যাবো—ওখানে একটা চমৎকার ঝরণা আছে।

আমি বলিলাম—সেই ভালো, আজ আর বেড়াতে ইচ্ছে করছে না।

রাত্রি আটটার মধ্যে আহার শেষ হইয়া গেল।

অরুণ বলিল—চলো, তোমাকে শোবার ঘরটা দেখিয়ে দিই।

তেতলায় একটিমাত্র বৃহৎ কক্ষ—সেখানে আমার শোবার ব্যবস্থা হইয়াছে। ছাদের বাকি অংশ খোলা, একদিকে একটি গম্বুজ—তার মধ্যে নীচতলা হইতে বরাবর একটা সিঁড়ি তেতলা পর্যন্ত উঠিয়াছে; অবশ্য বাড়ীর ভিতরের দিকেও আর একপ্রস্থ সিঁড়ি আছে।

তেতলার ঘরটি বেশ প্রশস্ত, ঘরের মধ্যে মূল্যবান মেহগনি কাঠের পালঙ্ক, চেয়ার, টেবিল, আর টেবিলের উপরে মস্ত একখানি আয়না। টেবিলের উপরে দুইদিকে মোমবাতিদান। এ সমস্তই পুরানো আমলের অর্থাৎ বাড়ী যে তৈয়ারী করিয়াছিল—এগুলিও তাহারি আমদানী।

শীতের আটটা রাত্রিই অনেক, তারপরে পথশ্রমের ক্লান্তি; কাজেই অরুণ বিদায় হইবামাত্র মোমবাতি দু'টা নিভাইয়া দিয়া বিছানায় শুইয়া পড়িয়া লেপ টানিয়া লইলাম, নিদ্রা আসিতে বিলম্ব হইল না।

কতক্ষণ ঘুমাইয়াছিলাম জানি না,কেমন একটা অস্বস্তি অনুভব করিয়া জাগিয়া উঠিলাম! প্রথমেই লক্ষ্য হইল ঘরটা আলোকিত, ভাবিলাম আমি তো মোমবাতি নিভাইয়া শুইয়াছিলাম, আলো জ্বালিল কে? মনে হইল হয় তো কোন কারণে অরুণ ঘরে ঢুকিয়াছিল—সেই জ্বালিয়া থাকিবে।

মাথা ফিরাইয়া দেখিলাম দরজা বন্ধ না খোলা। বন্ধ বলিয়া মনে হইল। এবারে টেবিলের দিকে তাকাতেই—ওকি! আয়নায় কার ছায়া? একি চোখের ভ্রান্তি না সবটাই স্বপ্ন? চোখের ভ্রান্তি হইতে পারে—কিন্তু স্বপ্ন নিশ্চয় নয়, আমি যে জাগ্রত তাহাতে সংশয় নাই।

ছায়ার পিছনে কায়া না থাকাও যে সম্ভব একথা তখন আমার মনে হয় নাই, মনে হইবার কারণও ছিল না, কাজেই ভাবিলাম এতরাত্রে এই অপরিচিত লোকটা আমাকে বিরক্ত করিতে ঘরে ঢুকিল কেন? কে এই লোকটা? পোষাক ও গায়ের রং দেখিয়া সাহেব বলিয়াই মনে হইল, সুতরাং ইংরাজীতে শুধাইলাম—তুমি কে?

ছায়া কোন উত্তর দিল না, এমনকি আমার প্রশ্ন শুনিতে পাইয়াছে বলিয়াও মনে হইল না, এমনি এক দূরাবস্থিত নির্লিপ্তভাব তাহার মুখে-চোখে। তাহার অবজ্ঞায় আমার বিষম রাগ হইল—তখন আমি উঠিয়া বসিয়া কায়াকে সম্বোধন করিবার উদ্দেশ্যে ঘাড় ফিরাইলাম। কিন্তু কায়া কোথায়? লোকটা মুহূর্তে পলাইল নাকি? ঘুরিয়া দেখিলাম আয়নায় ছায়াটি অবিচলভাবে বিগুমান! একি, কায়া নাই, ছায়া!

আমার শরীর কাঁপিতে লাগিল, মুখ শুকাইয়া আসিল, আমি আর বসিয়া থাকিতে পারিলাম না, শুইয়া পড়িলাম। কায়ার চেয়ে ছায়াকে যে মানুষের বেশী ভয়—এই প্রথম বুঝিলাম।

আমি যে ঘর ছাড়িয়া পালাইব, কিম্বা অরুণকে ডাকিব—সে শক্তিও হারাইয়া ফেলিলাম। সেই শীতের রাত্রে শীতল ঘামে আমার শরীর ভিজিয়া উঠিতে লাগিল।

মনে হইল ছায়ার দিকে তাকাইব না—কিন্তু সাধ্য কি? ঐ ছায়ার দিকেই তাকাইতে বাধ্য হইতেছি—এরূপ ক্ষেত্রে ছায়াকে উপেক্ষা করিয়া অন্যদিকে তাকানো মোটেই সম্ভবপর নয়।

একবার চোখ ফিরাই, আবার তখনি আয়নার দিকে তাকাই, এক একবার আড়চোখে চাহিয়া দেখি ছায়া আছে না মিলাইয়াছে।

আশ্চর্য! ছায়া একবারও আমার দিকে চাহিতেছে না, তাহার পক্ষে আমি যেন নাই। কেন জানিনা, একটু একটু করিয়া সাহস ফিরিতেছিল, বোধকরি ভয়ের চরমসীমায় আসিয়া পৌঁছিলে স্বভাবের নিয়মেই প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় বলিয়াই হইবে; বোধকরি অভ্যস্ত ভয় আর তেমন ভয়ঙ্কর মনে হয় না বলিয়াই হইবে; কিম্বা ছায়ার মুখে-চোখে এমন কিছু ছিল যাহাতে আমার বুদ্ধির অতীত সত্তা বুঝিয়াছিল যে, ভয়ের কারণ নাই।

সেই ছায়ার মুখে যে নৈরাশ্য ও বেদনার ছাপ—তেমন কোন জীবন্ত মানুষের মুখে কখনো দেখি নাই। ছায়াটি যেন আপনাতে আপনি মগ্ন হইয়া কত কি চিন্তায় মগ্ন।

এবারে দেখিলাম পকেট হইতে একখানা ক্ষুর বাহির করিল, এবং আমি বাধা দিবার পূর্বেই (ভুলিয়া গিয়াছিলাম যে, বাধা দিবার শক্তি আমার নাই) নিজের গলায় ক্ষুরখানা আমূলবিদ্ধ করিয়া দিল। তাহার মুখ পাণ্ডুর বিবর্ণ হইয়া গেল, শাদা সার্টের বক্ষদেশ রক্তে ভাসিয়া গেল এবং ছায়াদেহ মৃতদেহের মতো মাটিতে পড়িল।

এতক্ষণ আমি মুগ্ধবৎ সব দেখিতেছিলাম—হঠাৎ এবার সম্বিৎ ফিরিয়া পাইয়া শয্যাত্যাগ করিয়া, দরজা খুলিয়া একদৌড়ে বাহিরে ছাদের উপরে আসিয়া দাঁড়াইলাম। তখনো পূর্বদিকে উষার পূর্বাভাস জাগে নাই, কেবল ভোরের প্রথম ফিঙাটি কুণ্ঠিত ডাক সুরু করিয়াছে। আমি সোজা অরুণের দোতালার শয়নকক্ষের বন্ধ দরজায় আসিয়া ধাক্কা মারিলাম—ওঠো, ওঠো।

চা-পানের পর অরুণকে বলিলাম—কি, বিশ্বাস হ'ল না বুঝি।

অরুণ বলিল—যা নিজেও দেখেছি তা বিশ্বাস না করবার হেতু নাই।

—তুমি দেখেছ?

—হ্যাঁ।

—কেমন ক'রে?

—তুমি যেমন ক'রে দেখলে, ঐ ঘরে শুয়েছিলাম।

'—তবে জেনে শুনে আমাকে ওঘরে শুতে দিলে কেন?

—আমি ভেবেছিলাম যা দেখেছি তা আমার মনের ছলনা মাত্র অর্থাৎ গল্পে যা শুনেছিলাম রাত্রে তাই দেখলাম, ভাবলাম সবটাই সাব্‌জেকটিভ—

—ওঃ তাই আমাকে দিয়ে পরীক্ষা ক'রে নিলে?

—সত্য ভাবলে তোমাকে পরীক্ষার মুখে ঠেলে দিতাম না। ভেবেছিলাম সবটাই গল্প।

—কার কাছে শুনলে গল্প?

—সাহেবের চাপরাশির কাছে, সব ব্যাপার সে নিজ চোখে দেখেছিল।

· কোন্ সাহেবের চাপরাশি?

—যার এই বাড়ী ছিল।

—সবটা গুছিয়ে বলো শুনি।

অরুণ আরম্ভ করিল—বাড়ীটা ক'রেছিল মিঃ টমাস। চা-বাগানও ছিল তার। দূরে দূরে আরও অনেক চা-বাগানের মালিক ছিল সে। স্ত্রী ছাড়া আর তার কেউ ছিল না। একদিন কল্‌কাতা থেকে সাহেবের এক বন্ধু এসে হাজির হ'ল, মিঃ টমাস স্ত্রীর উপর তার আতিথ্যের ভার দিয়ে হঠাৎ দার্জিলিঙে চলে যেতে বাধ্য হ'ল। যেমন হঠাৎ যাওয়া তেমনি ফেরাও হঠাৎ। এসে দেখল, আতিথ্যটা খুব ঘনিষ্ঠভাবেই

চলছে। টমাসের রুদ্রমূর্তি দেখে বন্ধুতো তখনি পলাতক—স্ত্রী আর কোথায় পালাবে।

—তার পরে ?

—তার পরে সেই রাত্রেই টমাস তেতলার ঐ গম্বুজের মধ্যে স্ত্রীকে টেনে নিয়ে গিয়ে হত্যা করে।

—হত্যা ?

—হ্যাঁ, গুলী ক'রে মারে, তারপরে নিজেদের শয়নঘরে এসে, ওটাই শোবার ঘর ছিল, গলায় ক্ষুর বাধিয়ে আত্মহত্যা করে।

—এ সব দেখলো কে ?

—ঐ যে বললাম সাহেবের চাপরাশি। সে সব প্রত্যক্ষ দেখেছিল।

—এ কতদিনের আগের কথা ?

—প্রায় ত্রিশ বছর হবে।

—বাড়ী তো কিনেছ মাত্র বছর খানেক।

—হ্যাঁ, ঐ ঘটনার পর থেকে বাড়ীটা পড়েই ছিল, চা-বাগান করবার শখ হওয়ায় কিনেছি।

—সে চাপরাশিকে পেলে কোথায় ?

—সাহেব তাকে কিছু জমি কিনে দিয়েছিল—৪।৫ মাইল দূরে একটি গ্রামে সে থাকতো।

—তার মানে এখন নেই ?

—না, অল্প কয়েকমাস আগে লোকটা মরেছে।

—তোমার সঙ্গে পরিচয় হ'ল কি ক'রে ?

—আমি বাড়ীটা কিনেছি শুনে দেখা করতে এসেছিল, তার কাছেই গল্পটা শুনেছিলাম।

—একে এখনও গল্প বলছ কেন ?

—হ্যাঁ, দু'জনের চোখে যখন যাচাই হ'য়ে গেল, তখন আর গল্প বলা উচিত নয়।

—তুমি কি দেখেছিলে?

—তুমি যা কাল দেখেছ। তবে আগে গল্পটা শুনেছিলাম বলে বিশ্বাস করিনি। আর পাছে তুমি গল্প শুনে তার দ্বারা প্রভাবিত হও তাই আগে তোমাকে বলিনি।

দু'জনে চুপ করিয়া রহিলাম। অরুণ বলিল, শোবার ঘরে ঘটনার যেটুকু দেখলে তার পূর্বার্ধ—

—অর্থাৎ স্ত্রীকে হত্যা?

অরুণ বলিল,—হ্যাঁ, ঘটেছিল গম্বুজের মধ্যে; শুনেছি সেই নিদারুণ অংশটুকুরও ছায়াভিনয় চলে প্রতি রাত্রে ঐ গম্বুজের অন্ধকারে।

—কি ক'রে জানলে?

—আমাদের সরকার মশাই কি যেন দেখেছিলেন।

—কি?

—তা ঠিক তিনি বলতে পারলেন না, ছুটে পালিয়ে এসেছিলেন।

তারপরে একটু থামিয়া বলিল—যাবে আজ রাত্রে? চেষ্টা করবে দেখতে?

আমি বলিলাম—চলো।

স্থির হইল দু'জনে আজ তেতলার ঘরে শয়ন করিব—এবং রাত্রি গভীর হইবামাত্র একটা টর্চবাতি সঙ্গে করিয়া গম্বুজে প্রবেশ করিব—

দেখা যাক্—আর কি ছায়ারহস্য প্রকাশ পায়।

দু'জনে সারাদিন শঙ্কাময় রহস্যের আবহাওয়ায় দণ্ডপল গুণিতে লাগিলাম—কখন সন্ধ্যা হয়, কখন রাত্রি হয়!

কিন্তু আমাদের আশঙ্কাময় আশা পূর্ণ হইল না। হঠাৎ বিকেল-

বেলায় কলিকাতা হইতে জরুরী তার পাইয়া আমাকে তখনি রওনা হইবার জন্য প্রস্তুত হইতে হইল।

অরুণ বলিল—চলো, আমিও যাই, এ বাড়ীতে আর একা নয়।

—এখন বুঝি বুঝেছো যে, ওটা আর চোখের ছলনামাত্র নয়?

—ঠিক তাই।

সন্ধ্যার সময়ে দু'জনে স্টেশনের উদ্দেশ্যে যাত্রা করিলাম। রাস্তা মোড় ফিরিবার আগে একবার বাড়ীটার দিকে তাকাইলাম, দেখিলাম ছায়ারহস্যময় বাড়ীটা নিরেট এক ছায়ার মত নীরবে দণ্ডায়মান। মানব জীবনের নিদারুণ একটা ট্রাজেডির সাক্ষী ঐ নীরব অট্টালিকা। প্রতি রাত্রে ওরই একান্তে সেই ট্রাজেডির ছায়াভিনয় চলিতে থাকে। কেন, কি উদ্দেশ্য, কে বলিবে?

তবে ইহা নিশ্চয় করিয়া প্রত্যক্ষ করিলাম যে, সময় বিশেষে ছায়া কায়ার চেয়েও সত্যতর হইয়া উঠিতে পারে।

আরে সেই কথাই তো এতক্ষণ ধরে বোঝাতে চেষ্টা করছি।

—আমরাও বুঝতে চেষ্টা করছি।

—তবে গোল বাধছে কোথায়?

—তুমি বলছ ঐ আওয়াজ বাংলা দেশের কেবল দক্ষিণ অঞ্চলেই শুনতে পাওয়া যায়।

—তা বলছি বটে, তবে ঐ সঙ্গে আর একটু জুড়ে দিতে রাজি আছি, বাংলা দেশের সামুদ্রিক অঞ্চলে যে-শব্দ শুনতে পাওয়া যায়, তা কাছাকাছি অন্য প্রদেশের সমুদ্রতীরেও শুনতে পাওয়া যেতে পারে। কাল্পনিক উদাহরণেই বা প্রয়োজন কি? উড়িষ্যার কোন কোন স্থান থেকেও শুনতে পাওয়া যায় বলে রিপোর্ট পেয়েছি।

—কিসের রিপোর্ট পেলে হে? এখানে এই পাণ্ডববর্জিত রাজ্যে এসেও রিপোর্টের হাত থেকে রক্ষা নাই।

অরবিন্দ প্রবেশ করিয়া কথাগুলি বলিল।

আমরা দুইজনেই বলিয়া উঠিলাম, এসো অরবিন্দ। এতক্ষণ তোমার জন্যেই অপেক্ষা করছিলাম, চলো বেড়াতে বেরুবার সময় হয়ে গিয়েছে।

—তা তো হয়েছে, কিন্তু কিসের রিপোর্ট না শুনে বেড়াতে যাচ্ছি না।

—ত না হয় বেড়াতে বেড়াতেই হবে, কি বলো?

—সে মন্দ নয়, চলো।

তিনজনে বাহির হইয়া পড়িলাম।

রিপোর্ট-রহস্যে নামিবার আগে আমাদের তিনজনের যে পরিচয়টুকু গল্পের পক্ষে অপরিহার্য, তাহাই বিবৃত হইতেছে।

আমি সরকারী জিওলজিক্যাল সার্ভে বিভাগের অফিসার। কিছুদিন ঘোরতর খাটুনি গিয়াছে। এখন বিশ্রামের আশায় আসিয়াছি, আমার বন্ধু প্রবোধচন্দ্রের আশ্রয়ে। অরবিন্দ প্রবোধের বন্ধু ও প্রতিবেশী দুজনেরই অনেকগুলি করিয়া চায়ের বাগান আছে, কাঠের ব্যবসাও আছে, তাছাড়া প্রচুর চাষের জমির তারা মালিক, এসব অঞ্চলে জমির দুর্ভিক্ষ নাই।

প্রবোধের আশ্রয়ে আগেও একাধিকবার আসিয়াছি, কাজকর্মের চাপে পীড়িত হইয়া পড়িলে ছুটি লইয়া এই নির্জনপ্রায় স্থানে আসিয়া কিছুদিন আত্মগোপন করিয়া থাকি। এবারেও ফাল্গুনের প্রথমে আসিয়াছি—ইচ্ছা আছে ভালোভাবে গরম না পড়িলে ফিরিব না।

এখানে আমার প্রধান কাজ পড়িয়া পড়িয়া ঘুমানো; বিকাল বেলায় প্রবোধ ও অরবিন্দর সঙ্গে নদীর ধার বরাবর বেড়ানো; তাহাদের অবকাশের দিনে কাছে-ভিতে যেসব পাহাড় ও জঙ্গল আছে ঘুরিয়া ঘুরিয়া দেখা; আর প্রচুর খাদ্য গ্রহণ ও প্রচুরতর গল্প-গুজব করিয়া আড্ডা জমানো।

স্থানটি কুচবিহার ও আসামের সীমান্তে অবস্থিত, পল্লীর চেয়ে বড়, শহরের চেয়ে ছোট। ভূভারতে এতস্থান থাকিতে এই জায়গাটিতে যে বারংবার আসি তার কারণ, একবার দেখিলে পাঠক তুমিও ঘুরিয়া ঘুরিয়া আসিতে। এমন নদী, পাহাড় ও অরণ্যের প্রাকৃতিক দৃশ্যে সুসজ্জিত, অথচ লোকালয়ের সুখসুবিধা সম্পন্ন নির্জন স্থান আমি তো আর দেখি নাই।

কাল—ফাল্গুনের প্রথম, শীত বেশ প্রবল।

—কি হে, কিসের রিপোর্ট। বেশ নির্জন জায়গা, মন খুলে বলো কেউ শুনে ফেলবে সে ভয় করো না।

—তবে শোন।

এই বলিয়া আরম্ভ করিলাম।

—জিওলজিকাল সার্ভেতে মানুষে যেন না ঢোকে। জগতে যেখানে যত বনবাদাড়, পাহাড়পর্বত, নদীসমুদ্র আছে সেখানে ঘুরে বেড়াতে হবে। একবারের কথা মনে আছে। অনেকদিন আগের ঘটনা, গিয়েছিলাম আসামে মিশমি পাহাড় জরিপ করতে, বললে বিশ্বাস করবে কিনা জানিনা, সাত দিনের মধ্যে নিজের দলের কটি লোকের মুখ ছাড়া মানুষের মুখ দেখিনি, এমন কি একটা আদিবাসীর মুখ পর্যন্ত না। এমন চাকরি মানুষে করে? ছিঃ, ছিঃ।

এই কি তোমার রিপোর্ট নাকি?

—তুমি দেখছি রিপোর্ট না শুনে নিতান্তই ছাড়বে না, বলছি, বলছি। এবারে কিছুদিন আগে যে বড়সাহেব বিলাত থেকে এসেছেন তাঁর আবার বিজ্ঞানের বাতিক আছে। তিনি ওদেশে থাকতেই, বাংলাদেশের কোন কোন অঞ্চলে তোপধ্বনির মতো যে আওয়াজ শুনতে পাওয়া যায় সাধারণে যাকে 'বরিশাল গান' বলে থাকে, তার সংবাদ শুনেছিলেন। আফিসে এসে আমাকে ডেকে নিয়ে বললেন, রায়, তুমি বাঙালী, তাতে বৈজ্ঞানিক, তাতে সিনিয়ার অফিসার, ব্যাপারটার একটা কিনারা করতে চেষ্টা করো না কেন। সাহেব বললেন, তোমাকে যথেচ্ছ সুবিধা দেবো—কিন্তু এই অত্যাশ্চর্য প্রাকৃতিক বিস্ময়ের একটা কিনারা হওয়া আবশ্যক।

—বোঝো একবার ঠেলা! আমি একে বাঙালী, তাতে বৈজ্ঞানিক, তাতে সিনিয়র অফিসার, একেবারে ত্র্যহস্পর্শ যুক্ত, কাজেই আমার

স্বাচ্ছন্দ্য ও শান্তি গেল। সাহেব বলেছেন—অন্য যে কোন দেশে হ'লে এজন্য কত টাকা খরচ হ'ত, লোকের মনে কত উৎসাহ হ'ত। এমন ক্ষেত্রে আমার আগ্রহে শৈথিল্য নিতান্তই অমার্জনীয়। তাতে বড় সাহেব সত্যসত্যই সাহেব অর্থাৎ বিদেশী। হ'ত দেশী বড় সাহেব, একবার দেখে নিতাম!

—ওসব শুভ সঙ্কল্প থাক, কি করলে শুনি।

—কি আর করবো। বের হয়ে পড়লাম। বঙ্গোপসাগরের তীর বরাবর ঘোরা শুরু হল। কখনো স্টীমারে, কখনো রেলে, কখনো নৌকায়, কখনো কখনো মোটর গাড়ী ব্যবহারও করেছি। তখন বর্ষা-কাল, কষ্টের একশেষ।

—শীতকালে বেরুলে এত কষ্ট হত না।

—কিন্তু তার উপায় কি? বড় সাহেব যে বৈজ্ঞানিক। তিনি শুনেছেন 'বরিশাল গানের' আওয়াজ বর্ষাকালেই প্রবল হয়ে থাকে।

—কি রকম প্রবল আওয়াজ শুনলে?

—প্রবল যে সন্দেহ নেই। বরিশাল থেকে খুলনার মধ্যেই সবচেয়ে প্রবল, চব্বিশ পরগণার দিকে তুলনায় কম। এক একদিন রাত্রে ঘুম হ'ত না। যেমন গম্ভীর, তেমনি ঘন ঘন! মনে হ'ত পৃথিবীর কোন্ সুগভীর থেকে ওঙ্কার ধ্বনি উঠছে। মনে হ'ত একসঙ্গে সহস্র কামান যেন গর্জাচ্ছে!

—ব্যাপারটা সত্যিই রহস্যজনক।

—ঐ অঞ্চলের সাধারণ লোকদের ডেকে জিজ্ঞাসা করি, তোমরা বলতে পারো কিছু? কেউ বলে নদীর স্রোতে আর সমুদ্র-তরঙ্গে ঠোকাঠুকির শব্দ, কেউ বলে সমুদ্রের তীর ঘেঁষে অতলস্পর্শী সব গহ্বর আছে তারই মধ্যে থেকে উঠছে, সবাই বলে জন্ম থেকেই আওয়াজ শুনছে, আর বলে যে আসল কারণ কেউ জানে না।

—তাদের যখন জিজ্ঞাসা করি, তোমরা তো মাছ ধরতে সমুদ্রের জলে যাও, কিছু হদিস পাও না?

—তারা বলে আমরা কি লেখাপড়া জানি কর্তা! একজন বলল আমরা একবার স্রোতের টানে অনেক দূরে সমুদ্রের মধ্যে গিয়ে পড়েছিলাম, তখন আওয়াজ শুনে ছিলাম উত্তর দিকে।

—আর অন্য সময়ে?

সে বলল—এখন যেমন শুনছি, দক্ষিণ দিকে, কখনো পূব-ঘেষা দক্ষিণ, কখনো পশ্চিম-ঘেষা দক্ষিণ। সেই একবার উত্তর দিকে শুনেছিলাম।

—বুঝলে প্রবোধ এইভাবে তিন মাস কাটলো।

—সিদ্ধান্ত কি করলে?

—যথা পূর্বং তথা পরম। তবে এটুকু বুঝলাম যে ঐ শব্দের সঙ্গে সমুদ্রের একটা যোগাযোগ আছে। কারণ সমুদ্রতীর ভিন্ন শুনতে পাওয়া যায় না।...ওটা কিহে? নদীর ওপারে?

প্রবোধ। ওঃ কথায় কথায় অনেকদূর চলে এসেছি। তুমি এদিকে বুঝি আগে আসনি? ওটা চিলা রায়ের গড়।

আমি। যেমন প্রকাণ্ড, তেমনি কালো। যেন অমাবস্যার পাথর কেটে গড়া হয়েছে।

প্রবোধ। প্রকাণ্ড সন্দেহ নেই, তবে কালো নয়, অন্ধকার বলেই কালো দেখাচ্ছে।

এতক্ষণে হুঁশ হইল। চারিদিকে আলকাতরা-গোলা অন্ধকার। এমন সূচীভেদ্য নিরেট যে, ক্ষণে ক্ষণে জোনাকীর ফুলকাটা না হইতে থাকিলে অন্ধকারের প্রতীতি হইত কিনা সন্দেহ।

অরবিন্দ। আজ আবার অমাবস্যা। চল ফিরি।

সকলে ফিরিলাম। বাড়ীর কাছে আসিয়া অরবিন্দ বলিল, আমার শরীরটা তেমন ভালো নেই, আমি চললাম।

সে চলিয়া গেলে আমরা দুইজনে বাড়ীতে ঢুকিলাম।

হাতমুখ ধুইয়া দুইজনে মুখোমুখী বসিতেই পুরাতন প্রসঙ্গ উঠিল।

প্রবোধ। সাহেবকে রিপোর্ট দিলে ?

—সব খুলে বললাম।

প্রবোধ। সাহেব কি বলল ?

—সাহেব বলল, প্রথমবারে সম্পূর্ণ কিনারা না হলেই নিরুৎসাহ হবার কারণ নেই। সাহেব বলল যে, আগামী বর্ষাকালে স্বয়ং সে বের হবে। বুঝলে প্রবোধ আমি তখন ছুটি নেবো।

প্রবোধ। সাহেব উৎসাহ পেলো কিসে ?

—তা পাবেনা। ঐ শব্দের প্রসঙ্গে দুটো কারণ সুনিশ্চিত, কালটা বর্ষা, আর স্থানটা সমুদ্রোপকূল! ঐ দুটোর সঙ্গেই জড়িয়ে আছে আসল রহস্যটা।

—তোমার সাহেবকে এখানে নিয়ে আসতে পারো ?

—কেন বলো তো।

—ঐ আওয়াজ শুনিয়ে দিতে পারতাম।

—এখানে ? এই হিমালয়ের প্রান্তে ?

—হাঁ, এবং তাও আবার বর্ষাকালে নয়, শীতকালে।

—'বরিশাল গান ?'

—'বরিশাল গান' আর কেমন করে বলি, স্থানটা যখন বরিশাল বা তার কাছাকাছি নয়!

—সাহেব খবর শুনলেই ছুটে আসবে, কিন্তু শেষে না অপ্রস্তুত হই।

—কেন ?

—তুমি শুনেছো ?

—এ অঞ্চলের সবাই শুনে থাকে।

—শুনে থাকে! তার মানে আওয়াজ প্রায়ই হয়।

—না, বৎসরে একদিন মাত্র।

—একটা দিন ?

—বলা উচিত ছিল একটা রাত্রি।

—কিসের আওয়াজ ?

—লোকে কামান গর্জন বলে থাকে।

—কি আশ্চর্য! এখানে? ঠিক কোথা থেকে ওঠে বুঝতে পারো ?

—চিলা রায়ের গড়টা দেখেছ তো! ওখান থেকে।

—গড় থেকে ?

—না, লোকদের ধারণা নদীর মধ্য থেকে সেদিন চিলারায়ের কামান ওঠে।

—না, ভাই, আর সাহেবকে আনা চললো না দেখছি! এসব 'কামান ওঠা' রূপকথা বলতে গেলে আমার চাকরি থাকবে না।

—এটা ফাগুনের অমাবস্যা না হয়ে মাঘের অমাবস্যা হলে তোমাকে আজই শুনিয়ে দিতে পারতাম।

—রহস্য ক্রমেই ঘনতর হয়ে জমে উঠছে। কি জানো খুলে বলো।

—তবে স্থির হয়ে ব'সো। যে কাহিনী বলতে যাচ্ছি তা কারো প্রত্যক্ষ নয়, কারণ এ বহু শত বৎসর আগেকার কথা। সেই দূর সময় থেকে এই নিদারুণ স্মৃতি মুখে মুখে সঞ্চারিত হয়ে আজকার দিনে এসে পৌঁছেছে। মিথ্যা বলবার উপায় নাই—প্রত্যক্ষ প্রমাণ কামান গর্জন।

—কিংবা কামান গর্জনকে কেন্দ্র ক'রে একটা কাহিনী পল্লবিত হ'য়ে উঠেছে।

—তবু কামান গর্জনটা থেকেই যাচ্ছে, আর তোমারও তো আগ্রহ ঐ ব্যাপারটা নিয়ে—

—গল্পটাতেও আগ্রহ অল্প নয়, কি জানো জমিয়ে বলো।

—জমাবার প্রয়োজন হবে না, এ কাহিনী নাটকে আর চোখের জলে পূর্ণ।

—বলো, আর ভূমিকা নয়।

—তবে শোনো।

প্রবোধ গায়ে কাপড় জড়াইয়া বসিয়া আরম্ভ করিল। ঘরের মধ্যে আমরা দুটি প্রাণী, স্তিমিত আলোতে দেয়ালে মস্ত দুটি ছায়া, বাড়ি নির্জন, বাহির নির্জনতর, নিস্তব্ধতার আর অন্ধকারের যুগল আস্তরণে চরাচর নিরেট নীরন্ধ্র করিয়া জড়ানো।

ঐ যে ভাঙা গড় দেখলে ওটা চিলা রায়ের গড় নামে পরিচিত। কিন্তু আসলে ওটা নীলধ্বজ রাজার দুর্গ। চিলা রায় তার ছোট ভাই, তার প্রকৃত নাম শুক্লধ্বজ। সে ছিল নীলধ্বজ রাজার সর্বজয়ী সেনাপতি। চিলের মতো সে অতর্কিতে শত্রু সেনার উপরে গিয়ে পড়ে তাকে ছিন্নভিন্ন ক'রে ফেলতো, তাই লোকে তার নাম দিয়েছিল চিলা রায়।

চিলা রায়ের বাহুবলে ভুটানের প্রান্ত থেকে ব্রহ্মপুত্র অবধি সমস্ত ভূখণ্ড বিজিত হয়েছিল—এই রাজ্যের অধিশ্বর ছিল বড় ভাই নীলধ্বজ। দুই ভাইয়ের মধ্যে যেমন সৌহার্দ্য তেমনি সহযোগিতা ছিল। নীলধ্বজ ছিল সুশাসক রাজা, তার শাসনে হিন্দু মুসলমানে, ভুটানী বাঙালীতে ভেদজ্ঞান করা হ'ত না, আর চিলা রায় ছিল বীর্যবান সেনাপতি।

ভুটানীরা অনেক বার আক্রমণ করতে এসে তার হাতে মার খেয়ে ফিরে গিয়েছে, যেমন প্রতিহত হয়ে ফিরে গিয়েছে দরং, কামরূপ প্রভৃতি পূর্বাঞ্চলের সামন্ত রাজন্যগণ।

—চিলা রায়ের বীরত্বের রহস্য কি ছিল, পদাদিক না ঘোড়সোয়ার?

—বীরত্বের আসল রহস্য নিহিত থাকে বীরের প্রকৃতির মধ্যে, ঘোড়সোয়ার, পদাতিক গৌণ। তবু প্রশ্নটা তুলে ভালো করেছ।

চিলা রায়ের বীরত্বের সহায় ছিল—একটি প্রকাণ্ড কামান। কামানটা নাকি সতেরো হাত লম্বা ছিল, আর বসানো ছিল চারটা বড় বড় চাকার উপরে, টানবার জন্য জুড়ে দেওয়া হ'ত আট জোড়া ভুটানী ঘোড়া। কামানটার পাল্লা ছিল যেমন লম্বা, তেমনি তার গর্জন। সেই কামান যখন ডাকতো চার দিকের পাহাড় প্রতিধ্বনি ক'রে ক'রে তার আওয়াজ ছুঁড়ে দিত দূর থেকে দূরান্তরে, সেখানে যত শত্রু আছে সতর্ক হ'য়ে যেতো। চিলা রায় তার কামানের নাম দিয়েছিল—কালু খাঁ।

কোথায় পেলো সে এই অমোঘ অস্ত্র কেউ জানতো না, এমন কি নীলধ্বজ রাজাও নাকি জানতো না, কিম্বা জানলেও ভাইয়ের গুপ্ত রহস্য সে কাউকে জানায়নি।

ঐ কামানটা নিয়ে তখন নানা রকম কিম্বদন্তী প্রচলিত ছিল, এখনো আছে। কেউ বলে তরাইয়ের অরণ্যে গিয়ে মহাদেবের সাধনা করে কামনাটা কিরাতরূপী মহাদেবের কাছে থেকে বর পেয়েছিল। কেউ বলে নেপাল না তিব্বত কোথাকার রাজা তার বীরত্বে খুশী হয়ে তাকে পুরস্কার দিয়েছিল। আবার কেউ কেউ বলে—ওটা ছিল আগেকার কোন্ এক মহাবীরের অস্ত্র। সেই বীরের মৃত্যুর পর কামনাটা নাকি ব্রহ্মপুত্র নদের মধ্যে আত্মগোপন ক'রে ডুব দিয়েছিল।

একবার চিলা রায় চলেছিল দরং রাজার সঙ্গে যুদ্ধ করতে। মাঝ পথে ব্রহ্মপুত্রের ধারে সে শিবির সন্নিবেশ করছে, সন্ধ্যা বেলা একাকী ঘুরছে সে নদীর ধারে, এমন সময়ে দেখতে পেলো যেন প্রকাণ্ড একটা অজগর সাপ উঠে আসছে জল থেকে। বিস্মিত হয়ে চিলা রায় ভাবছে, ব্যাপার কি? এমন সময়ে দৈববাণী হ'ল—এই কামান নিয়ে যাও, তুমি সর্বত্র শত্রুজয়ী হবে। কামানের পূর্ববর্তী মালিকের শত্রু নাকি ছিল দরং রাজ। সেই থেকে, সেই কামান পাওয়ার পর থেকে চিলা রায় একেবারে অপরাজেয় হ'য়ে উঠল। লোকের মুখে মুখে কালু খাঁর খ্যাতি চারদিকে ছড়িয়ে পড়লো; শত্রুরা কাছে ঘেঁষতো না, যারা তেমন দুঃসাহস দেখাতো, নিঃশেষে বিলুপ্ত হ'য়ে যেতো কালু খাঁর কবলে। তখন দুই-ভাই নীলধ্বজ আর শুক্লধ্বজ নিশ্চিত হয়ে এসে বসলো এই গড়ে—ভাবলো এবার সুখশান্তিতে রাজ্য শাসন করবে, যুদ্ধতো সুশাসনের লক্ষ্য নয়, তার অপরিহার্য ভূমিকামাত্র।

—এমন সময়ে ভুটানের দেব রাজার মৃত্যু হ'ল। নূতন রাজা নীলধ্বজকে বলে পাঠালেন যে, তিনি উপঢৌকনাদি সহ নীলধ্বজের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবার ইচ্ছায় দুই রাজ্যের সীমান্তের দিকে আসছেন। এ রকম দেখা সাক্ষাৎ দুই রাজ্যের রাজার সঙ্গে মাঝে মাঝেই হ'ত। এতে নূতনত্ব কিছু ছিল না। বিশেষ নূতন সিংহাসন লাভ করবার পরে ভুটান রাজ যে দেখা করতে আসবেন, তা তো খুবই স্বাভাবিক।

চিলা রায় বলল—দাদা, আমি তোমার সঙ্গে যাবো।

নীলধ্বজ বলল—তার কি দরকার ভাই। এতো যুদ্ধ বিগ্রহ নয়, মামুলী সৌজন্য মাত্র। তার চেয়ে তুমি দরং রাজ্যের দিকে যাও। দরং রাজ আবার আমার রাজ্য আক্রমণ করবার উদ্যোগ করছেন বলে সংবাদ পেয়েছি।

তাই স্থির হ'ল। নীলধ্বজ প্রচুর উপঢৌকন ও কিছু লোকজন নিয়ে চলল সীমান্তের দিকে, আর চিলা রায় কালু খাঁকে নিয়ে চল্‌ল— আসামের পথে। তখন কে জানতো যে দুই ভাইয়ে সেই শেষ দেখা।

ভুটান সীমান্তে ভুটান রাজ ও নীলধ্বজের মধ্যে সাক্ষাৎ হ'ল, উপঢৌকন বিনিময় হ'ল। ভুটান রাজ দেখলে যে সঙ্গে চিলা রায় নেই, নেই তার অমোঘ কালু খাঁ। তখন সে সাহস পেয়ে সপরিচর নীলধ্বজকে বন্দী ক'রে সেখানেই হত্যা করলো। এ খবর চিলা রায়ের কাছে পৌঁছে দেবার লোকটা অবধি রইলো না। এই ঘটনা যখন ঘটছে, তখন চিলা রায় দরং রাজের সঙ্গে যুদ্ধে ব্যাপৃত। যেদিন দরং রাজ পরাজিত হ'ল জনশ্রুতি যোগে নিদারুণ দুঃসংবাদ গিয়ে পৌঁছলো চিলা রায়ের কাছে। চিলা রায় তখনি কালু খাঁকে নিয়ে দেশের দিকে রওনা হ'ল।

এ দিকে ভুটান রাজ নীলধ্বজের গড়ে এসে উপস্থিত হ'ল। সমস্ত নরনারী স্ত্রী-পুরুষ সে হত্যা করলো—আর লুট তরাজ তো করলোই। এমন সময়ে তার কানে পৌঁছলো যে চিলা রায় আসছে। তখন সে নীলধ্বজের দুর্গ, যা এখন চিলা রায়ের গড় নামে পরিচিত, তা ভেঙে বিধ্বস্ত ক'রে দিয়ে দেশের অভিমুখে পলায়ন করলো।

ওদিকে চিলা রায় ষোলঘোড়াবাহিত কালু খাঁকে নিয়ে গড়ের কাছে এসে পৌঁছলো। তখন রাত্রি, সে রাত্রি আবার এমনি অমাবস্যা, ঘোর অন্ধকার। চিলা রায় দূর থেকে দেখলো দুর্গে একটিও বাতি জ্বলছে না—আরও কাছে এসে দেখলো, দুর্গ আর দুর্গ নেই ভগ্নস্তূপ, আপন প্রেতাত্মার মতো তার ভগ্নাবশেষ নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। কাছাকাছি গ্রামের লোকের নিকটে সব সংবাদ সে শুনল, শুনে সেই দুর্ধর্ষ বীর

কামানের উপর বসে পড়ল। সেই প্রথম চিলা রায় হতাশ হ'ল, সেই প্রথম আর সেই শেষ। অনেকক্ষণ পরে উঠে চারিদিকে ঘুরেফিরে দেখল—আর কিছু করবার নেই, সত্যই সব শেষ।

লোকে বলল—ভুটান রাজাকে ভুটানে গিয়ে আক্রমণ করা যাক। কিন্তু চিলা রায় ভাবলো—তাতে কি ফলোদয় হবে? যুধিষ্ঠিরের মত ভাই কি ফিরবে? ফিরবে কি দুইজনের স্ত্রী-পুত্র-কন্যা, ফিরবে কি অপহৃত সম্মান? তখন সেই অজেয় বীর, দিগ্বিজয়ী সেনাপতি, লক্ষ্মণসম ভ্রাতা যা করলো, তা বীর ছাড়া কেউ করতে পারে না, আর ভগ্নহৃদয় বীর ছাড়াও কেউ করতে পারে না। সে নিজেকে কালু খাঁর সঙ্গে বেঁধে —ঐখানে, গড়ের কাছে ঐ নদীতে আত্ম-বিসর্জন করলো। কালু খাঁ চিরদিনের জন্য নীরব হ'ল।

—ওখানে কি নদীতে অনেক জল?

—একেবারে অতলস্পর্শ। গ্রীষ্মকালেও দড়ি নামিয়ে নামিয়ে থই পাওয়া যায় নি। এই মাত্র বললাম যে কালু খাঁ চিরদিনের জন্য নীরব হ'ল। কিন্তু ঠিক তা হ'ল না। প্রতি বৎসর মাঘী অমাবস্যার রাত্রে কালু খাঁ তীরে উঠে অদৃশ্য শত্রুর উদ্দেশ্যে নাকি গর্জন আর গোলাবর্ষণ করে!

—গল্পই, তবে সে গর্জন অনেকেই শুনেছে। আমিও কতবার শুনেছি।

—বোধ করি মেঘের ডাক?

—মাঘ মাসে মেঘ কোথায়?

—আর কিছু হবে?

—আর কি হ'তে পারে?

—এ বছর মাঘ মাসে—

—কই এখনো শুনছি বলে মনে হয় না।

গুড়ুম, গুড়ুম, গুম!

গুড়ুম, গুড়ুম, গুম!

—ও কি?

—তাই তো ও কি?

—ঐ তো কালু খাঁর গর্জন।

—কিন্তু আজ তো ফাল্গুন মাস।

—দাঁড়াও, দাঁড়াও, দেখি—এই বলিয়া প্রবোধ ছুটিয়া গৃহান্তরে গেল এবং এক লহমার মধ্যে একখানা পঞ্জিকা হাতে ছুটিয়া আসিল, বলিল—এবারে মাঘী অমাবস্যা ফাল্গুনে পড়েছে।

গুড়ুম, গুড়ুম, গুম।

আমি একটা বিজলি বাতি লইয়া বাহির হইয়া পরিলাম।

—ওকি, ওকি, কোথায় চললে?

ছুটিতে ছুটিতে বলিলাম—দেখি, কিছু দেখা যায় কি না?

আমার পিছু পিছু ছুটিতে ছুটিতে প্রবোধ বলিল—ফেরো ফেরো, ওদিকে আজ কেউ যায় না। কখনো, কখনো যারা গিয়েছে, তারা ফেরেনি!

—ওসব কুসংস্কার রাখো।

—দোহাই তোমার ফেরো।

দুজনেই নদীর তীরে গড়ের অভিমুখে ছুটিতেছি।

কামান গর্জন ক্রমশঃ ভীষণতর হইতেছে, তার মানে আমরা নিকটতর হইতেছি।

একবার মনে হইল নদীর ওপারে একটা আগুনের মতো যেন দেখিলাম।

আরো কাছে আসিয়াছি। একবার মনে হইল গড়ের কাছে প্রকাণ্ড অজাগরী একটা বস্তু! বোধ করি আমার কল্পনামাত্র।

এবারে দু'জনে নদীতীরে, সেই সান্ধ্য ভ্রমণের সীমায় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি।

বিজলী আলোর পিচকারী ফেলিয়া দেখিলাম ওপারে অদূরে গড়ের ভগ্নস্তূপ আর কোথাও কিছু নাই। এবারে নদীগর্ভে আলো ফেলিলাম! নিবাতনিষ্পন্দ জলতল আলোড়িত হইতেছে—খুব ভারি একটা পদার্থ এইমাত্র ডুবিয়া গেলে যেমন হয়, ঠিক তেমনি!

তবে কি শত্রু নিধন আকাঙ্ক্ষা জ্ঞাপন করিয়া কালু খাঁই ডুব দিল নাকি?

সেখানে অন্ধকার জলতলের ক্রমঃক্ষীয়মান আলোড়নের দিকে তাকাইয়া দুজনে মূঢ়ের মতো দাঁড়াইয়া রহিলাম, রহস্যের কোন সদুত্তর খুঁজিয়া পাইলাম না।

আজও পাই নাই, কিন্তু গর্জন যে মিথ্যা নয়, স্বকর্ণে যে শুনিয়াছি, তাহা খোদ সাহেবের সম্মুখেও সাহস করিয়া বলিতে পারি।

পাশের বাড়ী

সেবারে পূজার ছুটিতে [illegible] বড় ভিড়। কাছাকাছির মধ্যে সাঁওতাল পরগণায় ও ছোটনাগপুর অঞ্চলে স্বাস্থ্যকর ও অস্বাস্থ্যকর যত শহর আছে সবগুলির সবগুলি বাড়ী ভাড়া হইয়া গিয়াছে—অথচ লোক আসার বিরাম নাই। যাহারা বাড়ীর বন্দোবস্ত করিয়া আসিতেছে তাহারা জায়গা পাইতেছে, যাহারা অমনি আসিতেছে, স্টেশনে কয়েক ঘণ্টা বসিয়া থাকিয়া অন্য স্থানে যাত্রা করিতেছে ; বিরক্ত হইয়া অনেকে আবার কলিকাতাতেও ফিরিয়া যাইতেছে।

প্রফুল্লরা কোন একটি স্বাস্থ্যকর শহরে একটি বাসার সন্ধান করিতেছিল—কিন্তু সব জায়গা হইতেই খবর আসিতেছে, আর কয়েকদিন আগে চেষ্টা করিলেই বাড়ী পাওয়া যাইত—এখন নিরুপায়। প্রফুল্লরা প্রায় যখন হতাশ হইয়াছে—তখন সিংভূম জিলার কোন একটি ছোট শহর হইতে নরেনের চিঠি আসিল। নরেন প্রফুল্লর সহপাঠী। এখন উক্ত স্থানে সে কাঠের ব্যবসা করে। নরেন লিখিয়াছে যে একটি বাড়ী পাওয়া যাইতে পারে, বাড়ীটি ছোট তবে নূতন, স্থানের অভাব রঙের জৌলুষে পূরণ করিয়া দিতে পারিবে, আর ভাড়াটাও চাহিদার তুলনায় সাধ্যের একেবারে বাহিরে নয়।

প্রফুল্ল আনন্দিত হইয়া টেলিগ্রাফ করিয়া দিল—"এনগেজ এট্ওয়ান্স"—অর্থাৎ এখনি ভাড়া করিয়া ফেলো।

নরেন তারে জবাব দিল—"এনগেজড্ ষ্টার্ট"—ভাড়া করা হইয়াছে, রওনা হও।

পরদিন প্রফুল্ল তাহার স্ত্রীপুত্র ভাই বোন ও একটি চাকর সহ উক্ত স্থানে যাত্রা করিল।

স্থানটির নাম যে কেন গোপন রাখিতেছি গল্পটি পড়িলেই বুঝিতে পারা যাইবে।

বেলা আড়াইটার সময়ে প্রফুল্ল সপরিবারে নির্দিষ্ট স্টেশনে আসিয়া নামিল—নরেন প্লাটফর্মে উপস্থিত ছিল, সে প্রফুল্লদের অভ্যর্থনা করিয়া লইল। নরেন আগেই কয়েকখানা সাইকেল রিক্সাকে বলিয়া রাখিয়াছিল, এবারে সকলে সেই রিক্সা যোগে বাড়ীর দিকে চলিল; মিনিট কুড়ি পরে তাহারা সেখানে আসিয়া পৌঁছিল। প্রফুল্লরা দেখিল সত্যই বাড়ীটি নূতন আর সুন্দর, অবশ্য ছোট সন্দেহ নাই, তবে তাহারাও তো সংখ্যায় অগুণতি নয়, তাছাড়া বাড়ীর কম্পাউণ্ড বেশ বড়। দিনের বেলায় সেখানে কাটাইলেই চলিবে, খোলা হাওয়ায় থাকিতেই এখানে আসা।

প্রফুল্ল নরেনকে সঙ্গে করিয়া কম্পাউণ্ডের মধ্যে ঘুরিয়া চারিদিকটা একবার দেখিয়া লইতেছিল—

নরেন বলিল—এবার বড় ভিড়, চালাঘরখানা অবধি প'ড়ে নেই।

প্রফুল্ল শুধাইল—এমন কি প্রতিবছর হয়?

—আরে রাম! সব প'ড়ে থাকে, এবারে একটা বাড়ীও খালি নেই। কত চেষ্টা ক'রে যে এই বাড়ী পেয়েছি—

—আচ্ছা ঐ বাড়ীটা যেন খালি মনে হচ্ছে—

এই বলিয়া সে অদূরবর্তী পাশের বাড়ীটা দেখাইল। প্রকাণ্ড কম্পাউণ্ডের প্রচুর প্রাচীন গাছপালার মধ্যে মস্ত একটা বাড়ী।

নরেন বলিল—ও একটা পুরনো বাড়ী।

—যে চাহিদা তাতে পুরনো আর নূতন।

—ও বাড়ী ভাড়া দেয় না।

—বাড়িওয়ালা আসে বুঝি ?

—কখনো তো দেখিনি।

—আশ্চর্য। ভাঙাচোরা বুঝি ?

এমন কিছু অব্যবহার্য নয়।

ভাড়া বেশি বলে মনে হয়।

—অসম্ভব নয়। তাছাড়া ও-বাড়ীটা সম্বন্ধে—এমন সময়ে চায়ের ডাক পড়িল, আলাপের সূত্র ছিন্ন হইয়া গেল, দু'জনে ফিরিয়া আসিল।

২

শহরের কাছেই সুবর্ণরেখা নদী। নদীর একস্থানে কতকগুলা বড় বড় পাথরের খণ্ড পড়িয়া আছে। আগন্তুকগণের সেটি অবশ্য দ্রষ্টব্য। কলিকাতার বাবুরা আসিয়া সে স্থানটা দেখিতে যায়। শূন্য নদী খাতে শুষ্ক পাথরের খণ্ডগুলি দেখিয়া 'আহা আহা' করে, ফটো তুলিয়া নেয়, এবং জ্যোৎস্না রাত্রে সেখানে নিস্তব্ধ হইয়া বসিয়া থাকে। স্থানীয় লোকেরা বুঝিতে পারে না সেখানে এমন কি দেখিবার আছে, ভাবে কলিকাতার বাবুদের দৃষ্টিই আলাদা।

সেদিন প্রফুল্ল ও নরেন সন্ধ্যার আগে সেখান হইতে ফিরিতেছিল। যখন তাহারা বাড়ীর কাছে আসিয়া পড়িয়াছে প্রফুল্লর চোখ সেই পাশের বাড়ীর দিকে পড়িল, সেদিনের অসম্পূর্ণ আলাপ তাহার মনে পড়িল, শুধাইল—সেদিন এই বাড়ীটার কথা কি বলছিলে ?

নরেন বলিল—হাঁ, বাড়ীটা হানা-বাড়ী।

কৌতূহলী প্রফুল্ল শুধাইল—কিছু দেখেছ ?

—না, শুনেছি।

—কি শুনেছ?

—বাড়ীটায় রাত-বিরেতে নাকি আলো দেখা যায়, মানুষের গলার আওয়াজ শোনা যায়, ওখানে নাকি কে আত্মহত্যা করেছিল।

—প্রমাণ কি?

—আরে প্রমাণ নেই, সেই তো ভয়। তাছাড়া এসব জিনিষ কখনো প্রমাণ হয়?

—কেউ সন্ধান করেনি কেন?

—স্থানীয় লোক ভয়ে ওখানে প্রবেশ করে না।

প্রফুল্ল বাড়ীটার দিকে তাকাইল। ছমছমে অন্ধকারে প্রকাণ্ড বাড়ীটা মুখ ভার করিয়া দণ্ডায়মান। প্রফুল্লর গায়ে কাঁটা দিয়া উঠিল।

নরেন বলিল—মেয়েদের এসব কথা বলোনা, অযথা ভয় পাবে। তবে দেখো কেউ যেন ওদিকে না যায়, বিশেষ সন্ধ্যার পরে।

দু'জনে বাড়ীতে আসিয়া পৌঁছিল। যখন দু'জনে চায়ের পেয়ালা লইয়া বসিয়াছে—প্রফুল্লর ছোট ভাই টেবিলের উপর কতকগুলি শিউলি ফুল রাখিল।

প্রফুল্ল শুধাইল—কোথায় পেলিরে?

সে বলিল—পাশের বাড়ীতে প্রচুর আছে।

নরেন বলিল—এ যে সন্ধ্যাবেলাকার ফুল এখনো সব ফোটেনি।

গীতীশ বলিল—এখনি তুলে আনলাম, কত ফুল ওখানে।

নরেন প্রফুল্লর দিকে তাকাইল।

রাত্রে শয়নের পূর্বে প্রফুল্ল পত্নীকে বলিল—গীতীশ সেই যে ফুলগুলি তুলে এনেছে, ভালো করেনি।

পত্নী ভাবিল পরের বাড়ীর ফুল মনে করিয়া প্রফুল্ল একথা বলিতেছে, তাই বলিল—খালি বাড়ী—আনলোই বা!

—সেই জন্যই তো বলছি।

—কেন, কি হ'ল?

তখন সবিস্তারে সব কথা প্রফুল্ল তাহাকে বলিল—এবং সাবধান করিয়া দিল—একথা যেন ছেলেমেয়েদের না বলা হয়!

—নিশ্চয়, একথা কি আর বল্‌তে আছে বলিয়াই পত্নী তখনি গৃহান্তরে গিয়া তাহার দুই ননদকে ও গীতীশকে সব বলিয়া ফেলিল—কিছু রঙ চড়াইয়াই বলিল।

বড় ননদ ফুলু বলিল—তাই বলো বৌদি, ও বাড়ীটার দিকে তাকালেই গা ছমছম করে।

ছোট ননদ টুলু বলিল—আমি কাল রাতে একবার ছাদে গিয়েছিলাম, মনে হ'ল বাড়ীটার জানলায় যেন আলো!

গীতীশ কিশোর বালক, ভয় পাইয়াছে বলা চলে না, কিন্তু যেখানে তাহার দুই বোন একরূপ সাক্ষ্য দিতেছে, সেখানে তাহার অন্যরূপ বলা চলে না, তাই বলিল—আমি যখন আজ সন্ধ্যাবেলা ফুল আনতে যাই, মনে হ'ল বাড়ীর দোতালার বারান্দায় একটা যেন Shadow। তারপর বলিল—অবশ্য ভূতে আমি বিশ্বাস করি না।

ফুলু বলিল—ভারী বীর কিনা! তবে Shadow কিসের?

—অবশ্যই মানুষের!

—তবে মানুষটা দেখ্‌তে পেলে না কেন?

—অন্ধকার ব'লে।

—আহা কি বুদ্ধি! অন্ধকারে মানুষ দেখা গেল না—অথচ ছায়া দেখা গেল! একি হয় নাকি?

তাহাদের বৌদি জয়ন্তী বলিল—হয় কি নয় সে তর্ক থাক। ওদিকে আর যেওনা। আর এক কাজ করো—ওদিকের জানলাটা বন্ধ ক'রে দিয়ে শুয়ে পড়ো। সেদিন এই পর্যন্তই।

পরদিন নূতন কৌতূহলে সকলে পাশের বাড়ীর দিকে তাকাইল। ওবাড়ীতে একটু শব্দ হইলেই,—যদি একটা কাক জোরে ডাকে বা একটা জানলা খট্ করিয়া পড়ে সকলে নূতন অর্থভরা চাহনিতে পরস্পরের দিকে তাকায়। অবশ্য প্রফুল্ল এর মধ্যে নাই, কথাটা তাহার মনের অন্তরালে চলিয়া গিয়াছে।

সন্ধ্যাবেলায় প্রফুল্ল নরেনের সহিত বেড়াইতে বাহির হইয়াছে, তাহার স্ত্রী, দুই বোন ও ভাই বসিয়া জটলা করিতেছে, পুরনো চাকর প্রফুল্লর ছোট ছেলে ও মেয়েকে লইয়া বেড়াইতে গিয়াছে।

ফুলু বলিল—বৌদি কাল রাত্রে ওদিকে যেন একটা চাপা কান্না উঠছিল।

টুলু বলিল—আমিও শুনেছি।

গীতীশ বলিল—কুকুর কেঁদে থাকবে।

ফুলু ও টুলু বিরক্ত হইয়া শুধাইল—তুমি শুনেছ?

—অবশ্য শুনিনি, তবে কুকুর ছাড়া আর কি হবে?

ফুলু বলিল—তবে কেন কথা বল্‌তে এসেছ?

টুলু বলিল—জানো কুকুরে Spirit দেখ্‌তে পায়।

সকলের গায়ে কাঁটা দিয়া উঠিল। এমন সময়ে হরি মিনু ও তিনুকে লইয়া ফিরিয়া আসিল।

হরি বলিল—বৌদি, ও বাড়ীতে মস্ত একটা হনুমান আছে। গাছের উপর খুব শব্দ করছিল।

চার জনে উৎকর্ণ হইয়া উঠিল—

—কি ক'রে বুঝলি হনুমান?

—তাছাড়া সন্ধ্যাবেলায় গাছের উপর কি আর লাফাবে?

—সন্ধ্যাবেলায় কি হনুমান লাফায়? হনুমান যে কখন লাফায় না, জানা না থাকায় হরি বলিল—স্পষ্ট দেখলাম।

—কি দেখ্‌লে?

—কালো একটা কি!

—হনুমান কি কালো হয়?

—তাছাড়া আর কি হবে?

—যাই হোক, ওদিকে আর ছেলেমেয়েদের নিয়ে যেওনা—এই বলিয়া বৌদি ছেলেমেয়েদের লইয়া উঠিয়া গেল।

ফুলু বলিল—হরি ওদিকে আর যেও না।

কেন দিদি!

—কেন নয়! যেওনা বলছি।

টুলু বলিল—ও বাড়ী ভালো নয়!

গীতীশ ঠাট্টার সুরে বলিল—গোষ্ট!

—মানে ভূত প্রেত আছে!

হরি বসিয়া পড়িল।

কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া বলিল—তাই হবে দিদি! কাল রাতে ও বাড়ীর জানলায় যেন একটা আলো দেখ্‌তে পেয়েছি।

ফুলু ও টুলু সমস্বরে গীতীশের প্রতি বলিল—কেমন এবার হ'ল তো বীরপুরুষ!

—ভূতে কি আলো নিয়ে চলাফেরা করে!

—প্রয়োজন হ'লে করে।

—আমি বিশ্বাস করি না।

—বেশি বড়াই করো না, টেরটি পাবে।

—ভালই হবে, একটা নতুন জিনিষ জানা যাবে।

তারপরে গীতীশ বলিল—এত তর্কে কাজ কি। ঐ তো ক্যালেণ্ডারে দেখা যাচ্ছে পরশু অমাবস্যা—আমি ঐদিন রাতে যাবো ও বাড়ীতে, বাজি রাখতে রাজী আছো?

ফুলু বলিল—একশ বার রাজী।

টুলু বলিল—না।

—কেন? হেরে যাবে বলে?

—বিপদ ঘট্‌লে দাদার কাছে কে জবাবদিহি করবে?

—ঐ ব'লে পিছিয়ে যাওয়া! আচ্ছা, তোমরা বাজি রাখো না রাখো—আমি যাবই।

অনেক হয়েছে—এখন থামো।

পরশু দিন। শনিবারে অমাবস্যা পড়িয়াছে। শনিবারই যথেষ্ট, তার উপর অমাবস্যা। ভূত-প্রেতের বারো পোয়া সুবিধা। আরও একটা সুযোগ জুটিয়া গেল। সকাল বেলার গাড়ীতে প্রফুল্ল নরেনের সঙ্গে টাটানগর বেড়াইতে গেল, বলিয়া গেল, ফিরিতে অনেক রাত হইবে; বারোটার এদিকে নয়।

গীতীশ বলিল—আজ রাত্রে যাবো।

ফুলু বলিল—এমন কাজ ক'রো না।

টুলু বলিল—যাবে মানে অন্ধকারে খানিকটা কোথাও লুকিয়ে থেকে এসে বাহাদুরি করবে যে গিয়েছিলাম।

গীতীশ বলিল—আচ্ছা এক কাজ করো। সন্ধ্যার আগে তোমাদের একখানা রুমাল ঐ বাড়ীটার সামনে রেখে আসবো। তারপরে রাতে গিয়ে ওখানা আনবো। আর কি প্রমাণ চাও?

ব্যাপার শুনিয়া তাহাদের বৌদি নিষেধ করিল, বোনেরাও নিষেধ করিল, কিন্তু গীতীশ কিছুই শুনিবে না।

তাহাদের এক ভয় পাছে গীতীশের কোন বিপদ ঘটে। আর এক ভয় পাছে প্রমাণ হইয়া যায় সত্যই ও বাড়ীতে ভয়ঙ্কর কিছু নাই। পাশের বাড়ীতে ভীতিজনক কিছু আছে সে এক নূতন অভিজ্ঞতা, কলিকাতায় ফিরিয়া গিয়া কত গল্প করা যাইবে—সে সুযোগ তাহারা এমন ভাবে নষ্ট করিতে চায় না।

কিন্তু সমবয়স্ক মেয়েদের কাছে গীতীশের পৌরুষ আহত হইয়াছে, সে কিছুই শুনিবে না। সকলের নিষেধ সত্ত্বেও অপরাহ্নে ও বাড়ীতে রুমাল রাখিতে গেল। দুই বাড়ীর মাঝখানে ছোট একটা প্রাচীর, ডিঙাইয়া অনায়াসে পার হওয়া যায়। ফুলু ও টুলু প্রাচীরের কাছে গেল, গীতীশ রুমাল লইয়া প্রাচীর পার হইয়া ও বাড়ীর বাগানে ঢুকিল। তাহারা দেখিল বাড়ীটার সমুখে যে বাঁধানো বসিবার জায়গা আছে, সেখানে গীতীশ রুমালখানা রাখিল, তারপরে সে ফিরিয়া আসিয়া প্রাচীর পার হইল।

—কেমন দেখলে তো যে রুমাল রেখে এলাম।

গীতীশ কিছুতেই নিষেধ শুনিবে না। শেষ মুহূর্তে তাহার দুইবোন ও বৌদি কত করিয়া বারণ করিল, হাতে ধরিল—কিন্তু সে অটল।

অগত্যা তাহারা নিরস্ত হইল।

রাত বারোটার কাছাকাছি গীতীশ একখানি লাঠি হাতে রওনা হইল।

দোতালার বারান্দায় দাঁড়াইয়া তাহার বোন ও বৌদিরা ভয়ে নিঃশ্বাস বন্ধ করিয়া আশা-আশঙ্কায় মিনিট গণিতে গণিতে দেখিতে লাগিল। তাহারা দেখিল গীতীশ ধীরে ধীরে প্রাচীরটার কাছে গিয়া দাঁড়াইল, এবারে প্রাচীরের উপরে উঠিল, ঘন অন্ধকারেও বেশ বুঝিতে

পারা যাইতেছে। এবারে খুব সম্ভব সে ওপারে নামিয়াছে, কারণ তাহার শাদা জামাটা আরও অস্পষ্ট, এবারে আরও অগ্রসর হইয়া গেল—না! আর কিছু দেখা যাইতেছে না। বোধ করি গাছে আড়াল করিয়াছে! মেয়ে তিনটির ভয়ে নিঃশ্বাস পড়িতেছে না! কতক্ষণ হইল! এক মিনিট, তিন মিনিট, না দশ মিনিট! ভয়ের মুহূর্ত আর ফুরাইতে চায় না!

এমন সময়ে অন্ধকার বিদীর্ণ করিয়া গীতীশের আর্তস্বর উঠিল!

আলো হাতে করিয়া মেয়েরা, প্রাচীরের দিকে ছুটিয়া গেল!

প্রাচীরের কাছে এদিকে শাদা কি একটা বস্তু! লণ্ঠনের আলোয় দেখা গেল—মূর্ছিত গীতীশ!

'জল আন্, পাখা আন্, স্মেলিং সল্ট আন্!'

বিপদের উপরে বিপদ। এমন সময়ে প্রফুল্ল ও নরেন আসিয়া উপস্থিত। তাহারা এই মাত্র স্টেশন হইতে আসিতেছে, বাড়ীতে ঢুকিবামাত্র কোলাহল শুনিতে পাইয়াছে।

নরেন বলিল—সব বুঝেছি! কি সর্বনাশ! প্রফুল্ল বলিল—লক্ষ্মী-ছাড়া বুঝি বাহাদুরি দেখাবার জন্যে ও বাড়ী গিয়েছিল।

—নাঃ ভয় নেই, নিঃশ্বাসপ্রশ্বাস ঠিকই পড়ছে—নরেন ইতিমধ্যে তাহার বুকে পিঠে হাত দিয়া দেখিয়া লইয়াছে।

তখন সকলে মিলিয়া মূর্চ্ছিত গীতীশকে তুলিয়া লইয়া ঘরে গেল। শেষ রাতে তাহার মূর্চ্ছা ভাঙিল বটে, কিন্তু এত দুর্বল যে কথা বলিতে পারিল না। নরেনের আর সে রাত্রে বাড়ী যাওয়া হইল না। সারা রাত্রির সেবা-শুশ্রূষার পরে গীতীশ এতক্ষণে সম্পূর্ণ সম্বিৎ ও বাক্শক্তি ফিরিয়া পাইয়াছে। প্রথম কথাই সে বলিল—রুমালখানা কই? সেখানা আমি সঙ্গে এনেছিলাম।

—কিন্তু ভয় পেয়েছিলে কেন ? কিছু দেখনি কি ?

—সে আমি বলতে পারবো না। শাদা শাদা অনেকগুলো মূর্তি !

—তখনি বলেছিলাম যেও না।

সতীশ অস্ফুটস্বরে বলিয়া উঠিল—ও বাবা !

এমন সময়ে বাহিরে একটা গোলমাল শোনা গেল।

নরেন বলিল—দেখোতো প্রফুল্ল ব্যাপারটা কি ?

প্রফুল্ল জানালায় উঁকি মারিয়া বলিল—এ আবার কি ? পাশের বাড়ীটা যে পুলিসে ভর্তি হয়ে গিয়েছে।

—সত্যি ? তাইতো দেখি ! এ আবার কি রহস্য ?

রহস্যভেদের জন্য বেশিক্ষণ অপেক্ষা করিতে হইল না। দরজার কড়া নড়িয়া উঠিল। দরজা খুলিতেই একজন দারোগা নরেনকে বলিল—বাবু, আপনি আছেন আর ভয় নেই।

—কি হয়েছে ?

—একবার কষ্ট ক'রে সার্চ ওয়ারেণ্টের সাক্ষী হবার জন্য ও বাড়ীতে যেতে হবে।

—কি ব্যাপারটা আগে শুনি।

—আজ কয়েকদিন হ'ল ওখানে কয়েকজন ফেরারী আসামী বাস করছিল। খুঁজতে খুঁজতে এই মাত্র সন্ধান পেয়ে তাদের arrest করেছি।

—ওটা না ভূতের বাড়ী ?

—সেই ভয়ের সুযোগ নিয়েই ওখানে ওরা আশ্রয় নিয়েছিল, ভেবেছিল কেউ সন্দেহ করবে না।

—ক'জন লোক ?

—ছ'জন।

—চলো প্রফুল্ল একবার ঘুরে আসি।

—চলো, পাশের বাড়ীটা দেখবার কৌতূহল ছিল, দেখা হয়ে যাক্।

নরেন দারোগার উদ্দেশে বলিল—চলুন যাওয়া যাক।

তাহারা তিনজনে পাশের বাড়ীর দিকে রওনা হইল।

সাহিত্যে তেজিমন্দি

অনিরুদ্ধ সেন একজন উঠতি কবি। সহরের অধিবাসী হইলে তরুণ, সাম্প্রতিক, প্রগতিশীল প্রভৃতি অভিধা নামের 'শ্রী'র পরিবর্তে বসিয়া তাহাকে শ্রী-ভ্রষ্ট করিত সন্দেহ নাই, কিন্তু সুদূর মফঃস্বলের লোক বলিয়া তাহার নামে শ্রী থাকিয়া গেল বটে কিন্তু কবিতায় শ্রী আসিল না। তাহার মাতুলের কিছু জমি ছিল দামোদরের তীরে, বন্যা কমিয়া গেলে জমি উঠিত সেই উঠতি জমির সুবাদে অনিরুদ্ধের অভিধা পড়িল উঠতি কবি। প্রথমে মাতৃকুলেই বিশেষণটি আবদ্ধ ছিল, কিন্তু কালক্রমে চারকুলে (পিতৃকুল, মাতৃকুল ও দামোদর নদের দুই কূল) তাহার খ্যাতি ছড়াইয়া পড়িল, অনি বা অনিরুদ্ধ বা অনিরুদ্ধ সেন একজন উঠতি কবি।

কিন্তু কোন্ কবি কবে কুলগৌরব বর্ধনের জন্য কবিতা লিখিয়াছে, সমগ্র মানব সমাজের আনন্দবর্ধন তাহাদের উদ্দেশ্য। কাজেই অনিরুদ্ধ পত্র-পত্রিকায় কবিতা পাঠাইতে সুরু করিল। 'অমনোনীত কবিতা ফেরৎ পাঠানো হয় না—এমন কি ডাক টিকিট থাকিলেও ফেরৎ পাঠানো হয় না—'এই সম্পাদকীয় নীতির প্রমাণ-স্বরূপ তাহার কবিতাগুলি সম্পাদকীয় ঝুড়িতে মোক্ষলাভ করিতে লাগিল। অনভিজ্ঞ অনিরুদ্ধ ভাবিত ডাক টিকিটখানা বৃথা নষ্ট হয়। কিন্তু হায় কি করিয়া সে জানিবে যে সেই ডাকটিকিট সম্পাদকীয় পাওনাদারকে সান্ত্বনা দানের উদ্দেশ্যে নিযুক্ত হয় কিম্বা সহ-সম্পাদকীয় প্রণয়িনীর প্রতি প্রেম নিবেদনের জন্য প্রযুক্ত হয়। কেবল সে জানিত যে

সম্পাদকীয় সিংহ বিবরের সম্মুখে কবিতার প্রবেশ পদ-চিহ্ন আছে, নির্গম পদ-চিহ্ন নাই।

উঠতি কবি অনিরুদ্ধ দমিবার পাত্র নয়, উঠতি কবির দল দমিত হইলে সাহিত্যের ভূ-ভার অনেক কমিত। কলিকাতার বিভিন্ন মতাবলম্বী যাবতীয় পত্র-পত্রিকায় সে কবিতা পাঠাইত, আর দেখিত যে পৃথিবীর সর্ববিষয়ে তাহাদের মতভেদ থাকিলেও অনিরুদ্ধর কবিতার প্রকাশ যোগ্যতা সম্বন্ধে তাহারা একমত। প্রায় প্রতীক্ষমানা শবরীর মতো তাহার দশা হইয়া উঠিল, না আসিল পত্র-পত্রিকা, না আসিল কবিতা ফেরৎ, না আসিল রামচন্দ্র, কিন্তু সকল অভাব পূর্ণ করিয়া আসিলেন তাহার অগ্রজ, অনিমেষ সেন, কলিকাতায় কর্ম করেন।

তিনি শুধাইলনে, তুই বসে বসে কি করছিস।

সত্যের অনুরোধে তাহার বলা উচিত ছিল, কবিতা লিখছি, কারণ সত্যই তখন সে 'বিছুটি গাছ ও ছাগল' সম্বন্ধে একটি আধুনিক কবিতা লিখিতেছিল। কিন্তু কবিদের সত্যাগ্রহ তেমন প্রবল নয় বলিয়া সে বলিল, কি আর ক'রব ? ম্যাট্রিকুলেশনটাও তো পাশ হতে পারলাম না, তাই বেকার জীবন যাপন করছি।

বেশ, তবে আমার সঙ্গে চল, আমাদের অফিসে ঢুকিয়ে দেবো।

তারপরে তিনি একটু ভাবিয়া বলিলেন, তোর একটু লিখবার বাতিক ছিল না। বেশ হবে চল্। পরশু ফিরছি, তৈরী হয়ে নিস্।

অধিকাংশ মানুষ যে প্রস্তাবে খুসী হইত, সেই চাকুরীর প্রস্তাবে সে মুহ্যমান হইয়া পড়িল। সে ভাবিল সরস্বতীর সেবকের প্রতি লক্ষ্মীর একি লাঞ্ছনা। কিন্তু সে তো জানিত না যে একালে লক্ষ্মী সরস্বতীতে আপোষ হইয়া গিয়াছে। লক্ষ্মীর বরপুত্র শাদা কাগজে হিজিবিজি কাটিলে তাহা যুগান্তকারী রচনা বলিয়া পুরস্কার পায়, আবার সরস্বতীর

খাস দরবারে একবার নাম লিখাইতে পারিলে বাড়ীর দরজায় প্রকাশক, প্রযোজক ও সম্পাদকদের গাড়ীর সংখ্যা আঙ্গুলের সংখ্যাকে ছাড়াইয়া যায়। এ সব আধুনিক রহস্য না জানায় সে নিতান্ত বিমর্ষ হইয়া রহিল। কিন্তু তাহার অগ্রজ ছাড়িলেন না, তাহাকে লইয়া কলিকাতায় রওনা হইয়া গেলেন।

(২)

অনিরুদ্ধ এখন তাহার অগ্রজের আফিসে বিজ্ঞাপন লিখিবার ভার পাইয়াছে। যদিচ সে কনিষ্ঠ কেরাণী কিন্তু তাহার অগ্রজ সমস্ত কেরাণীকুলের অগ্রজ বিধায় এই দায়িত্বপূর্ণ ভারটি সে পাইয়াছে। অন্য কেরাণীরা ইসারায় বলাবলি করে মামা থাকলে সবই সম্ভব।

অনিরুদ্ধ একটি ছোট কামরায় বসিয়া অফিস সংক্রান্ত নানারূপ বিজ্ঞাপন লেখে, তারপরে নির্দ্দিষ্ট পত্র-পত্রিকায় প্রকাশার্থ পাঠাইয়া দেয়। আবার কখনো কখনো বিজ্ঞাপন প্রার্থী সম্পাদকদের চিঠির তাড়া লইয়া পড়ে, কোন পত্রিকা উপযুক্ত বোধ হইলে তাহাতে বিজ্ঞাপন পাঠাইতে পারে এমন নির্দেশ তাহার প্রতি ছিল। অনিরুদ্ধ দেখিল প্রত্যেক পত্রিকাই সর্বাধিক প্রচারিত, আর সম্পাদকগণ প্রত্যেকেই 'Confidentially' জানাইয়া দেন যে তাহাদের কাগজ দশ হাজারের অধিক মুদ্রিত হয়। বাঁধা কাগজগুলি ছাড়া নূতন কাগজেও মাঝে মাঝে সে বিজ্ঞাপনের কপি পাঠাইয়া দিত, কারণ তাহার অগ্রজ পরামর্শ দিয়াছিল ব্যবসার প্রসার যাহাতে হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখিবে।

কিন্তু তাই বলিয়া কেহ যদি মনে করেন যে কাব্য সরস্বতীকে সে ভুলিয়াছে তবে মস্ত ভুল হইবে। বিজ্ঞাপনের কপি লিখিবার অবকাশে

সে বসিয়া কবিতা লিখিত (হয়তো উল্টোটাই সত্য)। কাব্য রচনার এমন সুযোগ সে ইতিপূর্বে পায় নাই। কামরাটি নিভৃত, অবকাশ অখণ্ড, অফিসের কাগজপত্র যেমন দামী তেমনি প্রচুর, আর সরকারী ডাকটিকিটও তাহার জিম্মায় থাকিত। সরস্বতী তাহার প্রতি যদিচ এখন পর্যন্ত প্রসন্ন হন নাই, কিন্তু সদয় লক্ষ্মী তাহার ডাকমাশুলের দুশ্চিন্তা ঘুচাইয়া দিয়াছেন। অবশ্য বাধা যে কখনো না ঘটিত এমন নয়, তাহার অগ্রজ বা অন্য কোন লোক মাঝে মাঝে অতর্কিত ঘরে ঢুকিয়া পড়িত, হয়তো তখন সে সদ্য রচিত কবিতাটিকে খামে পুরিয়া নলের রাজহংসের মতো সম্পাদক দময়ন্তীর কাছে প্রেরণ করিতেছে, সেটাকে চাপা দিয়া খামে বিজ্ঞাপনের কপি পুরিত। এই ভাবে সুখে দুঃখে লক্ষ্মী-সরস্বতীর জোড়া নৌকায় পা রাখিয়া অনিরুদ্ধের চলিতেছিল।

(৩)

সেদিন আফিসে আসিয়া অন্যদিনের মতোই পত্র-পত্রিকাগুলি দেখিতে লাগিল। এগুলিতে অফিসের বিজ্ঞাপন ছাপা হইয়াছে। অন্যমনস্কভাবে পত্রিকগুলি উল্টাইতে উল্টাইতে সে চমকিয়া চেয়ার ছাড়িয়া লাফাইয়া উঠিল। বাংলাদেশে অন্য অনিরুদ্ধ সেন থাকা অসম্ভব নয়, কিন্তু এ যে তাহারই রচনা—

'হিমালয়ে বরফ গ'লে
ব্রহ্মপুত্রে বান
হে মাঝি সাবধান।'

আফিসের নিয়ম অগ্রাহ্য করিয়া কামরার দরজা সে বন্ধ করিয়া দিল

আর ঘরময় দাপাদাপি করিয়া ছাপার অক্ষরে প্রকাশিত প্রথম কবিতাটি সে পড়িতে লাগিল। বাল্মীকির মুখে প্রথম কবিতা, প্রথম প্রেমের অনুভূতি, প্রথম চাকুরীর নিয়োগপত্র প্রভৃতি মনে উচাটন ঘটায় নিঃসন্দেহ কিন্তু অনিরুদ্ধের মনোভাবের কাছে সে-সব নিতান্ত নগণ্য। আধ ঘণ্টা দাপাদাপি করিয়া যখন সে বসিল তাহার সর্বাঙ্গে ঘাম ঝরিতেছে। এতক্ষণে কিঞ্চিৎ সম্বিৎ পাইয়া দেখিল কাগজখানার নাম 'অন্য শিবির'। পাতা উল্টাইতে উল্টাইতে দেখিল আফিসের বিজ্ঞাপনও তাহাতে ছাপা হইয়াছে। তারপরে এ আবার কি? তাহার নামে 'অন্য শিবিরের' খামে চিঠি। সম্পাদক লিখিয়াছেন, 'আপনাকে পাইয়া আমরা রবীন্দ্রনাথের অভাব ভুলিলাম। প্রতি মাসে আমরা আপনার কবিতা, গল্প, প্রবন্ধ সানন্দে ছাপিব।' আরও লিখিয়াছে 'দয়া করিয়া আমাদের আফিসে একবার আপনার পায়ের ধূলা দিলে আমরা কৃতার্থ হইব!' তাহার স্মৃতিশক্তি প্রবলা হইলে মনে পড়িত যে এই 'অন্য শিবির' পত্রিকাই পূর্বে নিয়মিত তাহার কবিতা ফেরত দিয়াছে অর্থাৎ বাজে কাগজের ঝুড়িতে নিক্ষেপ করিয়াছে। কিন্তু সব সময়ে সব কথা মনে পড়ে না তাই সংসারে বাস করা সম্ভব হয়।

সেইদিন অপরাহ্নেই অনিরুদ্ধ রুদ্ধশ্বাসে ছুটিতে ছুটিতে (দুইবার বাস চাপা পড়িতে লাগিয়াছিল) 'অন্য শিবিরে' গিয়া পৌঁছিল। 'অন্য শিবির' তাহাকে দেখিয়া শিবাধ্বনি করিয়া উঠিল এবং বেয়ারাকে বলিল 'চা নিয়ে আয় দোকানে বলিস যে সেই ভালো কাপে যেন দেয় একজন মস্ত বাবু এসেছেন।'

অতঃপর 'অন্য শিবিরে' তাহার কবিতা ও আফিসের বিজ্ঞাপন নিয়মিত বাহির হইতে লাগিল। কিন্তু তাহার প্রতিভা অধিক দিন 'অন্য শিবিরে' আবদ্ধ থাকিল না, অল্পকাল মধ্যেই বিভিন্ন শিবিরে

ছড়াইয়া পড়িল। প্রত্যহ নূতন নূতন সম্পাদক তাহার কাছে আসিয়া কবিতা দাবী করে, উঠিবার সময়ে একখানি বিজ্ঞাপনও পায়, সম্পাদক বলে, না, না, ও থাক, ভাববেন না যে বিজ্ঞাপনের জন্য এসেছিলাম। শেষ পর্যন্ত অবশ্য বিজ্ঞাপনের কপি হাতে করিয়াই সে প্রস্থান করে। কোন কোন সম্পাদক বা ২।৩ সংখ্যা তাহার কবিতা ছাপায়, কিছুই দাবী করে না, অবশেষে বছরের বিজ্ঞাপন কণ্ট্রাক্ট করিয়া ফেলে। শেষে এমন হইল যে অনিরুদ্ধ কবিতা আর সাপ্লাই দিতে পারিত না। এক বছরের মধ্যে অনিরুদ্ধ সেন বাংলাদেশের সর্বাধিক পরিচিত কবি হইয়া দাঁড়াইল। হইবেই বা না কেন যে কাগজই খোলো অনিরুদ্ধ সেনের কবিতা আর তাহার আফিসের বিজ্ঞাপন। কাব্য ও ব্যবসা দুই-ই একযোগে বাড়িতে লাগিল; লক্ষ্মী-সরস্বতীর আড়াআড়ি পৌরাণিক কাহিনী; নূতন যুগে দু'য়ে সহযোগিতা।

এদিকে 'অন্ত শিবির' তাহার সচিত্র জীবনী ছাপিয়া বিজ্ঞাপনের চিরস্থায়ী চুক্তি করিয়া ফেলিল। তাই দেখিয়া প্রতিযোগী পত্রিকা 'ধুন্দুমার' কবি অনিরুদ্ধ সেন জয়ন্তীর আয়োজনে লাগিয়া গেল। এবং অবশেষে একদিন টালিগঞ্জের এক বাগানবাড়ীতে অনিরুদ্ধ সেনের গুণগ্রাহীগণ সমবেত হইয়া তাহাকে সম্বর্ধিত, 'কবি ভ্রমর' উপাধিতে ভূষিত ও স্রকচন্দনে চর্চিত করিল। পরদিন সংবাদপত্রে ফলাও করিয়া সচিত্র সংবাদ বাহির হইল, (তাহারাও বিজ্ঞাপন রসে বঞ্চিত হয় না।) ফলে বাংলাদেশের পাঠক সমাজ বুঝিল যে 'কবি ভ্রমর' অনিরুদ্ধ সেন একজন মহাকবি, সম্পাদকগণ বুঝিল যে সে একটি আস্ত নিরেট নির্বোধ, কেবল অনিরুদ্ধ নিজে কিছুই বুঝিল না, বুঝিল না এতকাল কেন তাহার কবিতা ছাপা হয় নাই, আর এখনই কেন বা কাড়াকাড়ি।

তারপরের ঘটনা খুব সংক্ষিপ্ত। কায়োমনোবাক্যে সাহিত্য সেবার উদ্দেশ্যে অনিরুদ্ধ চাকুরী ছাড়িয়া দিল। দুঃসংবাদ বিনা তারে সম্পাদক সমাজে প্রচার হইতে বিলম্ব হইল না—আর ফলটাও নাকি হাতে হাতে ফলিল। এই সেদিন মাত্র বাংলাদেশের পত্র-পত্রিকাগুলি বাণীর শ্বেত পদ্মের মতো অনিরুদ্ধ হইয়া 'কবি ভ্রমরের' কাছে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করিয়াছিল, আজ তাহা কিসের ইঙ্গিতমাত্রে একেবারে নিরুদ্ধ হইয়া 'কবি ভ্রমরকে' প্রত্যাখান করিল। কোন পত্রিকা তাহার কবিতা ছাপিল না, অধিকাংশ সম্পাদক ভালো করিয়া তাহার সঙ্গে কথাও বলিল না, কেবল চিরস্থায়ী বিজ্ঞাপন চুক্তির কৃতজ্ঞতায় 'অন্য শিবির' তাহাকে এক পেয়ালা চা জোগাইত, কিন্তু এবার আর ভালো পেয়ালার নির্দেশ হইত না। সেই কটু চা পান করিতে করিতে অনিরুদ্ধ ভাবিতে চেষ্টা করিত কেন এমন হইল? অনিরুদ্ধের নির্বুদ্ধিতায় লক্ষ্মীসরস্বতীর জোট ভাঙিয়া গিয়াছে তাই আজ তাহার এমন দুর্দশা।

সংস্কৃতি

বাসখানা কালীঘাট ট্রাম ডিপোর কাছে দাঁড়াইতেই চোখে পড়িল ট্রাম ষ্টপের কাছে ছোটখাটো একটি ভিড়। দোতলায় বসিয়াছিলাম তাই ভিড়ের আভ্যন্তরিণ রহস্য জানা আমার পক্ষে অনায়াস। দু'জন ভদ্রলোক, অন্ততঃ জামা, কাপড় জুতা তাই বলে, পরস্পরের দিকে রোষ কষায়িত নেত্রে তাকাইয়া আছে। ঐরূপ দৃষ্টি বিনিময় প্রায়ই নীরবে হয় না, কিন্তু পথের কোলাহল তাহা আমার কর্ণগত হইবার পক্ষে অন্তরায়। তবে দৃষ্টি বিনিময়ের অনুমান স্বরূপ যে সব বাক্য বিনিময় হইতে ছিল তাহা সহজেই অনুমান করিতে পারিলাম। আমিও যে বাঙ্গালী এবং জুতা জামা কাপড়ে ভদ্রলোক।

যে ট্রামখানায় আরোহণের প্রথম অধিকার লইয়া এই বিতণ্ডা বাধিয়াছিল, তাহা নিশ্চয় এতক্ষণে লালদীঘি পৌঁছিয়া গিয়াছে—আর পরবর্ত্তী দশখানা গাড়ীও নিশ্চয় লালদীঘি পৌঁছিল।

কিন্তু কোন অবস্থা দীর্ঘকাল ভারসাম্যে থাকে না, ইহা নৈসর্গিক নিয়ম না হইলেও একটি সামাজিক বিধি। আর খুব সম্ভব সেই বিধানের প্রেরণায় একজন ভদ্রলোক হঠাৎ লাফাইয়া অপর জনের চুল ধরিলেন, আর তিনি আততায়ীর ধরিলেন গলা। জনতা উৎসাহে আহা, আহা করিয়া উঠিল। আমি নামিয়া পড়িলাম। অবশ্য কাছেই নামিবার কথা ছিল।

ভিড়ের কাছে পৌঁছিয়া দেখিলাম যে বীরদ্বয় ধরাশায়ী হইয়া গড়াইতেছে, কখনো একজন উপরে কখনো অপরে।

আমি জনতার একজনকে লক্ষ্য করিয়া বলিলাম, ছাড়িয়ে দিন না।

পাঁচ জনে এক সঙ্গে পাঁচ রকম মন্তব্য করিলেন।

মাইরি আর কি! আফিস কামাই ক'রে দাঁড়িয়ে আছি, আর উনি বলেন ছাড়িয়ে দিন না।

ধর্ম্মপুত্তুর যুধিষ্টির এলেন আর কি।

স্বয়ং পণ্ডিত নেহরু, গোয়া সত্যাগ্রহে এসেছেন ঠাণ্ডা জল ঢালতে।

তেমন, তেমন কিছু হলে অবশ্য ছাড়িয়ে দিতেই হবে।

তবে রে শালা!

আয় না হারামজাদা—

শেষের উক্তি ছুটি আমার সম্বন্ধে প্রযুক্ত নয়, যুযুধানদ্বয় পরস্পরের প্রতি প্রয়োগ করিতেছে।

তারপরে যুযুধানদ্বয় যে সব উক্তি প্রত্যুক্তি করিতে লাগিল সে সব শব্দকল্পদ্রুমের মতো অতিকায় অভিধানে থাকিলেও থাকিতে পারে, কিন্তু জ্ঞানেন্দ্র দাস, সুবল মিত্র বা চলন্তিকায় অজ্ঞাত। এতদিন বিশ্বাস ছিল, গালাগালির পক্ষে হিন্দি ভাষাটাই প্রশস্ততম, আজ সে বিশ্বাসের পরিবর্তন আবশ্যক বোধ করিলাম।

এক্ষণে দুইজনের জামা কাপড় ছিঁড়িয়া, নাক মুখ রক্তাক্ত হইয়া গিয়াছে।

জনতার মুখে চোখে সে কি ঔৎসুক্য আর উল্লাস। জনতার ও ভদ্রলোক ছুটির এই প্রকাশ্য নির্লজ্জপনায় আমার মাথা ঘুরিতে লাগিল, আমি অলক্ষিতে সরিয়া পড়িবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিলাম।

নিন, নিন্, এবারে ছাড়িয়ে দিন, দেখুন না, মুখ দিয়ে রক্ত পড়ছে।

ঠিক, ঠিক, আস্থন।

তখন ৫।৭ জনে জোর করিয়া যুযুধানদ্বয়কে পরস্পরের আলিঙ্গন মুক্ত করিয়া দিল।

ঝড় থামে কিন্তু ঢেউয়ের দোলা থামিতে চায় না।

উক্ত ভদ্রলোক দুটি ধমক মারিবার অবকাশে দুইজনের প্রতি অকথ্য ভাষা প্রয়োগ করিতে লাগিল।

শালা আমার সেক্রেটারি।

তোর মতো ওরকম অনেক হারামজাদা প্রেসিডেন্ট দেখেছি।

শালা সেক্রেটারি হ'য়ে প্রেসিডেন্টের আগে ট্রামে উঠতে যাস কেন?

ওঃ সম্বন্ধী আমার প্রেসিডেন্ট হ'য়েছে ব'লে মাথা কিনে নিয়েছেন আর কি!

জনতার মধ্য হইতে একজন বলিল, তবে আপনারা পরিচিত।

পরিচিত বলে' পরিচিত। ওদের চৌদ্দ পুরুষ জানি, হাড় বজ্জাতের ঝাড়।

মারবো মুখে এক লাথি।

মশায়, আপনারা দুজনেই ভদ্রলোক। প্রকাশ্যে এমন আচরণ করতে আপনাদের লজ্জাবোধ করছে না?

লজ্জাটা কিসের শুনি? এ'তো আর সমিতির অধিবেশন নয়।

এই উক্তিতে সকলেই কৌতূহল বোধ করিল।

কিসের সমিতি আপনাদের?

আপনারাই বা সমিতির কি?

আমাদের সমিতির নাম দক্ষিণ কলিকাতা সংস্কৃতি সমিতি, ও বেটা সেক্রেটারি।

আমার আর দাঁড়াইয়া থাকিবার প্রয়োজন ছিল না। সমিতির নাম ডাক শুনিয়া সদস্য হইবার আশায় আবেদন পত্র হাতে আসিতেছিলাম।

উল্টা বাসে বাড়ী ফিরিয়া চলিলাম।

জামার মাপে মানুষ

সেকালে কোন মগুব্যবসায়ীকে ধনী বোতল ব্যবসায়ী বলিয়াছিল যে আপনি যার শাঁস বেচে বড়লোক আমি তার খোসা বেচি।

কথাটা অবাস্তব মনে হইত, বোতল বেচিয়া আবার ধনী হওয়া যায়। কিন্তু পুস্তক ব্যবসায়ে নামিয়া দেখিলাম যে কথাটি বেদবাক্য; সংসারে খোসারই দাম, কখনো সে খোসা বোতল, কখনো বা সে খোসা মলাট।

প্রথম যখন পুস্তকপ্রকাশ সুরু করি অনভিজ্ঞতাবশতঃ শাঁসের দিকে দৃষ্টি রাখিয়াছিলাম। সৎ ও উচ্চাঙ্গ সাহিত্য প্রকাশের চেষ্টা করিতাম আর বলিলে হয় তো কেহ বিশ্বাস করিবে না সে রকম পুস্তকও মিলিত। লোকে পড়িয়া বাহা, বাহা করিত, বলিত এতদিনে বইয়ের বাজারে বশিষ্ঠের আবির্ভাব হইল। কিন্তু অল্প দিনের মধ্যেই মুদ্রিত পুস্তক, কাগজ ও ছাপাখানার বিলের ভারে কলির বশিষ্ঠ কলিজা ভাঙিয়া বসিয়া পড়িল। ব্যবসা বন্ধ করিয়া দিব ভাবিতেছি সেই ব্যবসায়ীর উক্তি মনে পড়িল। তখন শাঁস ছাড়িয়া খোসার দিকে মন পড়িল। লোকে যতটা কানাকানি করে ততটা না হইলে 'টু পাইস' কিনা দু' পয়সা সঞ্চয় করিয়াছি।

এখন আমি মলাট ছাপি। অবশ্য দুই মলাটের অভ্যন্তরে খান-কতক মুদ্রিত পৃষ্ঠা থাকে, কিন্তু সে নিতান্ত ঢাকের বাঁয়ার মতো, নিতান্ত না থাকিলে নয় বলিয়াই থাকে। দীর্ঘকালের অভিজ্ঞতায় মানুষে আবিষ্কার করিয়াছে যে ভিতরে কিছু মুদ্রিত অংশ থাকিলে তাহাতে

জৌলুষ খোলে ভালো, নতুবা অন্তঃসার শূন্য মলাট একেবারে ঢল্‌ঢল্‌ করে। খদ্দের আসিয়া মলাটের রঙ, রেখা ও বাহার দেখিয়া বই পছন্দ করে; বইয়ের বাজার তাসের খেলার মতো শেষ পর্যন্ত রঙের খেলায় পরিণত হইয়াছে। তবে সত্যের অনুরোধে না বলিয়া পারিতেছি না যে উচ্চাঙ্গ মলাটের অভ্যন্তরে উচ্চাঙ্গ সাহিত্য থাকিলে খদ্দের তাহাকে দোষ বলিয়া মনে করে না। মোটকথা এই যে প্রকাশকগণের উদ্যমে সরস্বতীর শুভ্র কপোলে ইন্দ্রধনুর বাহার ফুটাইয়া তুলিয়াছে। বাংলা মলাটের প্রশংসায় বাঙালী পাঠক পঞ্চমুখ, হইবেই বা না কেন, বাঙালী যে জাতশিল্পী। শাঁসের চেয়ে খোসার দর অধিক প্রতিপন্ন হইয়া সেই বোতল ব্যবসায়ীর কথাকে সত্য প্রমাণ করিয়াছে।

কিন্তু একদিন যে এই নিদারুণ সত্য আমার জীবনেই প্রমাণিত হইবে তাহা কে জানিত! প্রমাণিত হইবে যে সংসারে বোতল ও মলাটের মতো জামারই আদর, জামার দরেই মানুষের দর!

এখনো ভাড়া বাড়ীতে থাকি। ইচ্ছা করিলে একখানা কেন তিন খানা বাড়ী তৈয়ারি করিতে পারি। কিন্তু ইনকামট্যাক্স বিভাগের সহস্র চক্ষু এখনো ব্যবসায়ীদের অন্ধিসন্ধি সন্ধানে নিযুক্ত, তাই ভাড়াটে বাড়ীর মুখোস পরিয়া দারিদ্র্যের ভান করিয়া আছি। সময় বিশেষে দারিদ্র্যই ধনের প্রকৃষ্টতম ছদ্মবেশ। ইহাতে প্রমাণ হয় যে সংসারে দারিদ্র্যেরও একটা প্রয়োজন আছে।

মোটর কিনি নাই, কারণ মোটর সচল হইলেই ইনকামট্যাক্স বিভাগও নাকি চঞ্চল হইয়া ওঠে। তাহারা কোন্‌ সূত্রে খবর পায় জানি না, তবে ঈর্ষ্যাপরায়ণ মানব স্বভাববিশিষ্ট প্রতিবেশী থাকিতে সূত্রের অভাব কি। বাড়ীও নাই, মোটরও নাই, কাজেরই আমার গুপ্ত ধনের সন্ধান মৃত্যুঞ্জয় ইনকামট্যাক্স বিভাগেরও (এখন সত্যই মৃত্যুঞ্জয়,

কারণ মৃত্যুর পরেও Estate duty নামে সে হস্ত বাড়াইয়া থাকে) অজ্ঞাত। অনেকে জিজ্ঞাসিতে পারেন যে টাকার ব্যবহার হইল না সে টাকার সার্থকতা কি? 'টাকা আছে'—এই বোধটা মানুষকে এমন পরম তৃপ্তি দান করে যে প্রকাশ করিবার আকাঙ্ক্ষা সে অনুভব করে না। ইষ্টনাম প্রকাশ শাস্ত্রেও নিষিদ্ধ বটে। অবশ্য ধন আছে জানিলে অনেক সুবিধা কিন্তু অসুবিধাও কম নয়। 'আছে' ও 'নাই' তৌল করিয়া দেখিয়াছি যে, 'নাই' পক্ষই কিছু ভারি, অন্ততঃ আমার মত সেইরূপ।

যাক্, এবার আসল ঘটনাটি বলিয়া ফেলি। ঘটনা সংক্ষিপ্ত, তাই দীর্ঘ ভাষ্য করিতে হইল।

আমার স্ত্রীর নাম মৃগাক্ষী এবং তাহার মৃগী রোগ আছে। যখন তখন তড়কা ওঠে আর ডাক্তারের প্রয়োজন হয়। সেদিন অনেক রাতে সে মৃগবৎ আচরণ সুরু করিলে উদ্‌ভ্রান্ত অবস্থায় ডাক্তারকে ফোন করিবার উদ্দেশ্যে খালি গায় খালি পায় রায়বাবুদের বাড়ীতে ছুটিলাম।

দরজায় দারোয়ানজী খাটিয়া পাতিয়া শয়ান ছিলেন। সে তড়াক করিয়া উঠিয়া বসিয়া বলিল—আরে অন্দর মৎ যাও। দারোয়ানের এরূপ নিষেধের জন্য প্রস্তুত ছিলাম না।

আরে, আমি যে মুখার্জি।

মুখার্জি উখার্জি নেহি জানতা। আভি বাবুকো দেখা নেহি মিলেগা।

এই পর্যন্ত বলিয়া সে হাতড়াইয়া অনুভব করিল ভোজপুরী পাকা লাঠিখানা পাশে আছে কিনা।

তাহার উক্তি ও নিরুক্তির উপরে আর কথা চলে না। কাজেই ফিরিয়া আসিলাম।

ততক্ষণে পত্নীর মৃগীরোগের তড়কা সারিয়াছে, কাজেই তত্ত্ব চিন্তার অবকাশ জুটিল। অন্যান্য স্বামীদের সুবিধা হইতে পারে আশায় প্রকাশ করিতেছি যে মৃগীরোগের একমাত্র উদ্দেশ্য অসময়ে স্বামীকে উদ্ব্যস্ত করিয়া তোলা নতুবা কুমারী, বিধবা ও পুরুষের ঐ রোগ হয় না কেন? নতুবা স্বামী বিদেশে বা বাড়ীতে অনুপস্থিত থাকিলে পত্নীর ঐ রোগ হয় না কেন? নতুবা উদ্‌ভ্রান্ত স্বামী দারোয়ানের তাড়া খাইয়া ফিরিয়া আসিয়া দেখে কেন যে মৃগীর আক্রমণ দূর হইয়াছে।

যাই হোক, প্রথমেই যে জিজ্ঞাসা মনে উদিত হইল, দারোয়ান বাধা দিল কেন? এই রায়বাবুদের বাড়ীতে আমি নিত্য সান্ধ্য অতিথি, প্রতিদিন প্রবেশ কালে উক্ত দারোয়ানজীই উঠিয়া দাঁড়াইয়া আমাকে সেলাম করিয়াছে। রায়বাবুদের ছোট ছেলেটি একটি সদ্য পক্ষোদ্‌ভিন্ন সাহিত্যিক, এক খানা বই ছাপিয়া দিবার জন্য আমার কাছে নিত্য উমেদারি করে, ঐ রাম অবতার তেওয়ারী কত দিন তাহার পত্র আমার হাতে আনিয়া দিয়াছে, আবার কতদিন আমার ছদ্মভাষী 'বাবু বাড়ী নাই' উত্তর বহিয়া লইয়া গিয়াছে, আসিতে যাইতে দুইবার সেলাম জানাইয়াছে। তবে সেই তেওয়ারী এখন বলিল কেন যে মুখার্জি উখার্জি নাহি জানতা! এ কেমন রহস্য।

সহসা আয়নায় আমার উদ্‌ভ্রান্ত চেহারা, খালি গা, খালি পা দেখিয়া এক মুহূর্তে রহস্যের মীমাংসা হইয়া গেল, বুঝিলাম তখন আমার খোসা ছিল, এখন নাই, তখন জামা চাদর জুতা ছিল, এখন শুধু শাঁসটা, তৈরী পোষাকেই মানুষের পরিচয়, শুধু দেহে সে নির্বিশেষ, খোসা না পাইলে বাঙালী পাঠক ভোলে না, ভোজপুরী তেওয়ারির অন্তর্দৃষ্টি তাহার চেয়ে বেশী হইবে আশা করাই অন্যায়। এই কথা মনে হইবা মাত্র যাবতীয়

গ্লানি দূর হইল বরঞ্চ দারোয়ানজী যে আমার নীতিরই একজন সমর্থক ভাবিয়া এক প্রকার গৌরব অনুভব করিলাম।

পরদিন সন্ধ্যা বেলায় নিয়মিত সময়ে রায়বাবুদের বাড়ী ঢুকিলাম তেওয়ারী শশব্যস্তে উঠিয়া সসম্ভ্রমে সেলাম করিল।

অভ্যাস মতো উক্ত সেলামটি অবহেলায় পকেটস্থ করিলাম, বুঝিলাম যে আমি এখন জামা চাদর জুতা ঘড়িতে রীতিমতো খোসাবন্ত।

সেই দিনই গভীর রাত্রে আমার সহধর্মিণী মৃগী রোগাক্রান্ত হইয়া মৃগবৎ আচরণ করিতে লাগিল। পূর্বাপর চিন্তার অবকাশ না পাইয়া আবার খালি গায়ে খালি পায়ে আলুথালু অবস্থায় রায়বাবুদের বাড়ীতে ঢুকিতে গিয়া দারোয়ানজীর কাছে বাধা পাইলাম।

আরে দারোয়ানজী হামকো জান তা নেহি? হাম মুখার্জি বাবু হ্যায়।

নেহি, নেহি, মুখার্জি উখার্জি কিসিকো হাম জানতা নেহি। আভি ভাগো।

ফিরিয়া আসিলাম। অতি পুরাতন সত্য আবার নূতন করিয়া বুঝিলাম। মনে পড়িল সংসারে খোসারই দর। তাই জামার মাপেই মানুষের মাপ; মনে পড়িল যে আমিও তো ক্ষেত্রবিশেষে ঐ নীতি চালাইয়া থাকি, তবে ভোজপুরী দারোয়ানজীকে আর বৃথা দূষিতে যাই কেন?

থার্মোমিটার

এক

একবার টেরামাইসিন দিয়ে দেখ্‌লে হয় না।

যা ভাল বোঝেন করুন, মোট কথা জ্বরটুকু তো যাওয়া দরকার, অনেকদিন হয়ে গেল।

অল্প জ্বরকেই তো ভয় করি, বেশি জ্বর সহজসাধ্য।

ডাক্তারবাবু, তবে না হয় টেরামাইসিন দিয়েই দেখুন। ওষুধটার নামও তো শুনিনি আগে।

সবে বেরিয়েছে, অসাধ্য রোগের যম।

তবে তাকেই ডাকুন।

হাঁ পেনিসিলিন, ষ্টেপটোমাইসিন সবই তো দিয়ে দেখলাম।

প্রেস্কৃপশন লিখে দিন, আনিয়ে নিই।

আর ওতে কিছু ফল না হলে ডাঃ চ্যাটার্জিকে একবার কল দিতে হবে, চৌষট্টি টাকা ফি, তবে আমি ধরলে বোধ করি পঞ্চাশেই রাজি হবেন।

কিন্তু ঐ যে ৯৯° জ্বর কেন বলতে পারেন।

দেখুন, ষ্টুল, স্পুটাম, ইউরিন, ব্লাড সবই তো পরীক্ষা করলাম। আবার X-ray প্লেট তুলে, Cardiograph নিয়ে ওর দেহের আগাগোড়া জরিপ ক'রে ফেলেছি কিন্তু কোথাও কোন focus বা Toxin তো পেলাম না। খুব সম্ভব নূতন কোন ব্যাধি হবে।

অতটুকু ছেলে, ওর শরীরে আর কত সয়।

ওতেই তো মুস্কিল হয়েছে। ভালো ক'রে প্রকাশ করতে পারে না কি হয়েছে।

যাই বলুন ডাক্তারবাবু, বাইরে থেকে দেখতে বেশ সুস্থ দেখায়। ওর মা বলে কোন অসুখ হয়নি ডাক্তারবাবু ভুল করছেন।

অসুখ সারতে দেরী হলে সবাই ঐ এক কথা বলে থাকে ডাক্তারবাবু ভুল করেছেন। আরে অসুখটা তো ডাক্তারবাবুর সৃষ্টি নয়। তাঁছাড়া আপনার থার্মোমিটার তো ভুল করে নি। আমার থার্মোমিটার হলেও বা বলতে পারতেন টাকা আদায় করবার জন্যে সেটা খারাপ ক'রে রেখেছি—যাতে একটু ক'রে জ্বর ওঠে।

ডাক্তারবাবু আপনি রাগ করবেন না—আপনার উপরে কোন উদ্দেশ্যের আরোপ করি নি।

তা আমি বুঝেছি। যাক গে, তা হলে টেরামাইসিন দেওয়াই স্থির।

তার তাতেও ফল না হলে ডাক্তার চাটুজ্জেকে কল্ দেওয়া।

বেশ তবে তাই স্থির রইলো।

দুই

ভুক্তভোগী পাঠক এতক্ষণে নিশ্চয় বুঝিতে পারিয়াছেন যে বিচক্ষণ ডাক্তার ও রুগীর অভিভাবকের মধ্যে কথোপকথন হইতেছিল। যদুবাবুর তিন বছরের ছেলে রামু। সে বেচারা আজ তিন মাস হইল মৃদুজ্বরে ভুগিতেছে। ছাড়ে না, বাড়েও না, কমেও না, ৯৯°এর অঙ্কে অচল অটল হইয়া জ্বর বিরাজ করিতেছে। তিন চার দিন পরে ডাক্তার আসিল, এবং আজ তিন মাসের মধ্যে কুইনিন, প্যালুড্রিন হইতে সুরু করিয়া পেনিসিলিন, অরোমাইসিন, ক্লোরোমাইসিন, ষ্টেপটোমাইসিন

সব হইয়া গিয়াছে। কিন্তু একরোখা জ্বর বগলে থার্মোমিটারটি দিবামাত্র সেই পুরাতন ৯৯°। সকলে বলিতে সুরু করিয়াছে ইহাকেই বলে ৯৯ এর ধাক্কা।

অথচ ছেলেটির এদিকে বেশ সুস্থ সবল লাবণ্যপূর্ণ চেহারা। অনেকে বলেন এমন অবস্থায় ও জ্বরটুকু গ্রাহ্য নাই করিলে। আবার অনেকে বলেন—বাপরে, তা কি হয়। ঐটুকু জ্বরই বা থাকিবে কেন? ওষুধ বদলাও, তার চেয়েও ভাল ডাক্তার বদলাও।

দুই-ই হইয়া গিয়াছে। ডাক্তার তিন চার দফা বদল হইয়াছে—আর ওষুধ বদলাইতে বদলাইতে সব শেষ হইয়া গিয়াছে এখন আর একটি মাত্র ঔষধ অপরীক্ষিত আছে—টেরামাইসিন। উক্ত ঔষধ ব্যবহারের পূর্বাহ্ণে যদুবাবু ও ডাক্তারের মধ্যে যে কথোপকথন হইয়াছিল পাঠক তাহা শুনিয়াছেন।

তিন

টেরামাইসিন প্রয়োগ করিয়াও ফলোদয় হইল না এবং তাহার পরিণামস্বরূপ যদুবাবুর ভাগ্যাকাশে ডাক্তার চাটুজ্জের উদয় হইল। ডাক্তার চাটুজ্জে ডাকসাইটে ডাক্তার, তাঁহার দাপটে রুগীর অভিভাবক ও স্বয়ং যমরাজ একঘাটে জল খায়। তিনি ঘরে ঢুকিয়া একবার রুগীকে দেখিয়া লইলেন তারপরে ডাক্তার বোসকে (যিনি আগে চিকিৎসা করিতেছিলেন) বলিলেন, দেখি রিপোর্টগুলো।

আধ মিনিটে রিপোর্ট দেখা শেষ করিয়া ষ্টেথোস্‌কোপটি নাচাইতে নাচাইতে বলিলেন—ভেরী সিরিয়স, একে আর একদিনও এখানে রাখবেন না। কালই সুইজারল্যাণ্ডে পাঠিয়ে দিন। তারপরে ডাক্তার

বোসের সুপারিশে চৌষট্টি টাকার স্থলে পঞ্চাশ টাকা মাত্র লইয়া প্রস্থান করিলেন। অন্যদিকে যদুবাবু সপরিবারে বসিয়া পড়িয়া একবাক্যে বলিয়া উঠিলেন সুইজারল্যাণ্ড, সে কি মশায়।

ডাক্তার বোস বলিলেন, যে রোগের যে ওষুধ।

রামুর মা ছেলেকে কোলে লইয়া বলিলেন, গা-টা বেশ ঠাণ্ডা মনে হচ্ছে, দেখিতো একবার থার্মোমিটার দিয়ে।

থার্মোমিটার অভিজাত দোকানের দরের মতো এক বাক্যে ৯৯° হাকিল।

রামুর মা রাগিয়া 'তবে রে মুখ পোড়া যন্তর' বলিয়া থার্মোমিটারটি মাটিতে সবেগে নিক্ষেপ করিলেন, থার্মোমিটার শতখণ্ড হইয়া গেল।

ডাক্তার বোস বলিলেন, মিসেস্ রায় থার্মোমিটার ভাঙলেই কি রোগ দূর হবে ?

স্ত্রীর ব্যবহারে যদুবাবু অপ্রস্তুত হইয়া গিয়াছিলেন। তিনি বলিলেন, ডাক্তারবাবু, আপনার থার্মোমিটারটা বের করুন।

রামুর বগল হইতে ডাক্তারবাবুর থার্মোমিটার বাহির করিয়া সবাই বিস্মিত হইয়া গেল—একি এ যে ৯৭·৪°।

আবার দিন তো।

এবারেও ৯৭·৪°।

আচ্ছা, পাশের বাড়ীর থার্মোমিটারটা চেয়ে আনো তো।

তাহাতেও উঠিল ৯৭·৪°।

তবে কি আমাদের থার্মোমিটারটাই খারাপ ছিল ?

ডাক্তার বোস বলিল—তাই বা কেমন ক'রে সম্ভব ? এত ওষুধ, এত পরীক্ষা, এত গুলো ডাক্তার, সব তো মিথ্যা হতে পারে না।

কিন্তু তা হলে থার্মোমিটারে জ্বর না উঠবে কেন ?

সেটাও একটা রোগ কিনা পরীক্ষা করে দেখতে হবে।

আমার ছেলে নিয়ে আর পরীক্ষা করতে হবে না বলিয়া রামুর মা ছেলেকে ডাক্তারের কাছ হইতে ছিনাইয়া লইয়া প্রস্থান করিলেন, চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিলেন, ওরে আমার রামুর কোন অসুখ হয় নি। আমি আগেই জানতাম। যত সব মুখপোড়া—

ডাক্তার বোসের এতক্ষণে বোধহয় সম্বিত হইল, বলিলেন, তবে বোধ করি থার্মোমিটারটাই খারাপ ছিল। আচ্ছা আসি যদুবাবু।

যদুবাবু খুঁটিয়া খুঁটিয়া ভাঙা থার্মোমিটারের টুকরা গুলি সংগ্রহ করিতে লাগিলেন।

গৃহিণী গৃহমুচ্যতে

৭৭৭ নম্বর আসামী হাজির হ্যায় ?

৭৭৭ নম্বর আসামী হাজির হ্যায় ?

হ্যায় রে, বাবা হ্যায়, বলিয়া একটি স্থূলকায় প্রৌঢ় ব্যক্তি বিচারকের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল।

ওঃ তুমি! বিচারক একবার মুখ তুলিয়া চাহিলেন।

আজ্ঞে বলিয়া প্রৌঢ় রামহরি একটি অর্দ্ধস্ফুট নমস্কার করিল।

বিচারক নথীপত্রে দৃষ্টি আবদ্ধ রাখিয়া বলিলেন যে তোমার মামলাটা বেশ কৌতূহলজনক। জীবনের প্রথম বাইশ, তেইশ বৎসর পুণ্যের ভাগই বেশি দেখছি। তারপর থেকে সব উল্টে গিয়েছে। এই তো দেখতে পাচ্ছি বাইশ বছর পর্যন্ত মিথ্যা কথা একরকম বলোই নি। তারপরে হঠাৎ এত মিথ্যা কথা বলতে সুরু করলে কেন ?

আজ্ঞে তখন যে বিয়ে করলাম।

বিয়ে করলে তো কি ?

হুজুর মনে হচ্ছে বিয়ে করেন নি!

না, করি নি, নথী থেকে মুখ না তুলিয়াই বিচারক বলিলেন। তারপরে আবার, কিন্তু বিয়ের সঙ্গে মিথ্যাকথার সম্বন্ধ কি ?

ঠিক বিয়ের সঙ্গে নয়, কিন্তু বিয়ের ফলে যিনি ঘরে এলেন সেই পত্নীর সঙ্গে।

তুমি তো আচ্ছা বেল্লিক হে, তুমি বল্‌তে চাও তোমার স্ত্রী তোমাকে মিথ্যা শিখিয়েছে ?

কি আকারে বললে আপনি ও আমার উত্ত-ফেলে আসা স্ত্রী খুশী হবেন জানি না। কিন্তু ব্যাপারটা তাই।

আর একটু বুঝিয়ে বলো।

সেই ভালো। দেখুন স্যার, নিতান্ত নির্বোধ ও নপুংসক না হলে কেউ কখনো স্ত্রীর কাছে সদা সত্য কথা বলতে পারে না।

কেন ?

ধরুন একদিন রাত্রে একটু ফিরতে দেরী হ'ল, তখনি এক ঝাঁক প্রশ্নের হুল দংশন করবে, কেন দেরী, কোথায় গিয়েছিলে, মুখে পানের দাগ কেন, অমন আরো কত কি! তখন একমাত্র উপায় মিথ্যা বলতে হবে যে একজন লোকের কাছে কিছু টাকা পাওনা ছিল তাগাদায় গিয়েছিলাম! অমনি তিনি বলবেন দিলে কিছু ? কিচ্ছু না। বেটা ভারি পাজি।

আচ্ছা, দিলে আমার হাতে এনে দিও। ওটা তো মাসিক আয়ের মধ্যে নয়।

তোমার মাসিক আয় তোমার স্ত্রী জানতো তা'হলে।

পাগল নাকি ?

কেমন ?

কেমন আর কি ? বেতন থেকে পঞ্চাশ ষাট টাকা কমিয়ে তাকে জানিয়েছিলাম।

কেন ?

কেন কি হুজুর। ঐ পঞ্চাশ ষাট টাকাই আমার যথাসর্বস্ব। আফিসে বা পথে ঘাটে জলটল খেতে হবে তো।

এই তো তোমার নথীতে দেখতে পাচ্ছি যে মদ খেতে। সে টাকাও কি আলাদা রাখতে।

না, না, হুজুর, সে খরচ আমার স্ত্রী স্বহস্তে তুলে দিত।

এ কেমন ধারা হ'ল, জল খাওয়ার পয়সা দিত না, মদ খাওয়ার পয়সা দিত।

ওর মধ্যে একটু পলিটিক্স আছে। সময় মতো মাতাল বলে খোঁটা দিতে পারবে এই আশায় মদের পয়সা দিতো।

ওঃ অনেক মিথ্যা বলেছ যে দেখছি।

অনেক হবে বই কি। ঘণ্টায় আঠারোশ মিথ্যা বল্‌লে অনেক না হ'য়ে পারে।

কিন্তু মাঝে মাঝে ২।১ মাস ফাঁক কেন?

তখন সে বাপের বাড়ী গিয়েছে।

তোমার তিনটা ছেলে মেয়ে না খেয়ে মরেছে, আর দুটো মরেছে অচিকিৎসায়। কেন, কারণ দর্শাও।

আজ্ঞে, কারণ প্রায় একই।

কি শুনি!

প্রথম তিনটা মরেছে জল খেয়ে আর শেষের দুটো মরেছে জলপড়া খেয়ে।

সে আবার কি?

প্রথম প্রথম দুধ খাওয়াতাম, বেশ মোটা সোটা হয়ে উঠ্‌ল। এমন সময় গিন্নি বল্‌লে আমাদের কি দুধ খাওয়াবার মত অবস্থা। বার্লি আনো। এক কৌটা বার্লিতে এক বছর চল্‌লে তাকে জল ছাড়া আর কি বলে? বাছারা আমার শুকিয়ে মারা গেল।

আর জলপড়া খেয়ে কি রকম?

দুজনেরই এক সঙ্গে হল জ্বর, আনলাম ডাক্তার ডেকে। তাদের স্নেহময়ী জননী দিল ডাক্তার বিদায় ক'রে। বল্‌ল, ডাক্তারে তো ভারি

জানে। আমাদের গোবরার জলপড়া ধন্বন্তরি! তার পরিণাম যা ঘটবার তিন দিনের মধ্যেই ঘট্‌ল। হুজুর, অন্য ছেলে দুটোও মরতো, কিন্তু ইতিমধ্যে লড়াই বাধায় তারা বেঁচে গেল। চোরাই কারবারীর সুড়ঙ্গে ইঁদুরের ভূমিকা নিলো। এখন বেশ দু' পয়সা করেছে। ওদের মায়ের বড় আদরের ওরা।

তার মানে ওরা অসদুপায়ে টাকা রোজগার করে?

অত ঘুরিয়ে বলবার দরকার কি স্যার! চোর! চোর। সত্য চোর।

আর সেই চোরকে তাদের মা আদর করে।

তবে কাকে আদর করবে প্রত্যাশা করেন, হুজুর! নেংটেকে!

তুমি কিছু বলো না!

দু' একবার বল্‌তে গিয়ে শুনলাম যে আমি নাকি ধর্মপুত্তুর যুধিষ্ঠির। সেটা যুধিষ্ঠিরের পক্ষে অপমানজনক মনে ক'রে বলা ছেড়ে দিয়েছি।

এই যে আবার এক অসহায় বিধবার গচ্ছিত তহবিল ভেঙেছ। এ কাজ করতে গেলে কেন?

ভেঙেছি নয় স্যার, ভাঙতে বাধ্য হয়েছি।

কেমন?

তহবিল না ভাঙলে আমার মাথাই ভাঙতো।

কে?

মাথার যিনি মালিক।

ভগবান?

পত্নী! স্যার, শাস্ত্রে বলেছে 'আত্মানং সততং রক্ষেৎ দারৈরপি ধনৈরপি', দারৈরপি করবার সুযোগ আর পেলাম কোথায়? তাই ধনৈরপি মাথা বাঁচালাম।

অনেক পাপ যে করেছ? মিথ্যা ভাষণ, অনাহারে ও অচিকিৎসায় পুত্রকন্যা বধ, পরস্বাপহরণ—

আরো আছে হুজুর নাবালক ভাইভগ্নীদের বাড়ী থেকে বিতাড়ন, বৃদ্ধ পিতামাতাকে তীর্থবাসে প্রেরণ—

যদি অন্যায় বোঝো তবে এসব কাজ করতে গেলে কেন?

স্ত্রীর প্ররোচনায় তু'পয়সা বাঁচাবার জন্যে। আরো আছে হুজুর।

বলো।

পরদার গমন।

সে আবার কি?

পাড়ায় এক ধনী যুবতী বিধবা ছিল। তার ইচ্ছা পূরণ ক'রে অনেক টাকা পেলাম।

তোমার স্ত্রী জানতো?

তাকে খুশী করবার জন্যেই ও কাজ করেছি।

কি বলো! সে কি তোমাকে পরদারগমন করতে বলেছে।

কথায় বলে নি, ইসারায় বলেছে।

কি আশ্চর্য। এ যে মানব-স্বভাব বিরুদ্ধ।

কিন্তু শাস্ত্রবিরুদ্ধ নয়।

কেমন?

'আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা তারে বলি কাম
কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা প্রেম তার নাম'।

নিজের সুখের জন্য করলে কি আর রক্ষা ছিল। এ যে তাকে খুশী করবার জন্যে করেছি কিনা।

খুশীর কারণ?

ধনী বিধবার ধন।

এত অকথ্য, জঘন্য পাপ করতে গেলে কোন্ উদ্দেশ্যে ?

উদ্দেশ্য কল্‌কাতা সহরে একটি বাড়ী তৈরী।

তুমি বল্‌তে চাও কল্‌কাতা সহরে যত লোকে যত বাড়ী তৈরি করেছে সমস্তই এই সব উপায়ে ?

হুজুর যে বাজার পড়েছে, তাতে সৎপথে থেকে একখানা কুঁড়ে ঘর তৈরি করা যায় না, বাকিটুকু আপনি বুঝে নিন।

কিন্তু পাপ ক'রে বাড়ী তৈরি করবার কি প্রয়োজন ছিল ?

হুজুর পাপ হবে আমার বাড়ী হবে আমার স্ত্রীর, বাধাটা কোথায় ?

কিন্তু বাড়ীর জন্য তোমার স্ত্রীরই এমন আগ্রহ কেন ?

সে-ও শাস্ত্রের কথা হুজুর, শাস্ত্রে সবই আছে। 'গৃহিনী গৃহমুচ্যতে।'

তোমার কি ধারণা যে সমস্ত স্ত্রীই এইরকম।

তা কেমন ক'রে বল্‌বো হুজুর, একটার বেশী তো জানবার সৌভাগ্য হয় নি। তবে মনে হয় যে No woman is good enough to to be a man's wife.

সেসব তত্ত্ব কথা থাক। এখন শোনো। এই সমস্ত পাপের দণ্ড একা তোমাকেই ভোগ করতে হবে।

একশ বার। কি দণ্ড ?

ত্রিশ হাজার বছর নরকবাস।

একটা অনুরোধ আছে হুজুর। আমি ত্রিশ বছর বিবাহিত জীবন যাপন করেছি, তাতে ক'রে নরকবাসের মেয়াদ ভোগ কিছু কমেছে কিনা একবার তৌল ক'রে দেখুন।

ঠিক কথা।

বিচারকের আদেশে একজন চাপরাশি রামহরিকে পাশের ঘরে লইয়া গিয়া ধর্ম-কাঁটায় তুলিয়া দিল আর কিছুক্ষণ পরে ফিরিয়া আসিয়া

বলিল—হুজুর, ত্রিশ হাজার বছর মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়ে আরো কিছু ফাও দাঁড়িয়েছে।

বিচারক শুধাইলেন, রামহরি বলো তোমার কি চাই? অনেকটা সময় তুমি অকারণ দণ্ড ভোগ করেছ। এখন তোমার বাঞ্ছাপূরণ করবো, কি চাও? স্বর্গ না মুক্তি?

ও দুটোর কোনটাই নয়, আমার ইচ্ছা পুনর্জন্ম।

আবার পুনর্জন্ম! তুমি কি বাতুল।

না হুজুর আমি মানুষ। পৃথিবী ছাড়া আর কিছু জানিনে, কেবল এইটুকু দয়া করবেন, আমার কুষ্ঠিতে বিবাহযোগ লিখবেন না, লিখবেন শুধু প্রেমযোগ।

বিচারক বলিলেন—তথাস্তু।

অমনি রামহরির অশরীরী সত্তা শোঁ করিয়া নিম্নমুখী হাউই-এর মতো মর্ত্যলোকের দিকে চলিয়া গেল।

চিত্রগুপ্ত চাপরাশিকে বলিলেন—আজকার মতো বিচার শেষ, নথীপত্রগুলো ভালো ক'রে তুলে রাখ।

গোল্ড ইনজেকশন

পাশের ঘরে আমার সহধর্মিণী করুণ আর্তনাদ করিতেছে, না আছে তাহাতে ছেদ, না আছে স্বরগ্রামের খাদে অবতরণ। এমন তিন দিন চলিতেছে। স্ত্রীলোকের হৃদয় যে পরিমাণে কোমল, ফুসফুস সেই পরিমাণে সতেজ। সদর রাস্তার পাশেই বাড়ীটি। ভয়ে ভয়ে ঘরের দরজা জানালা বারে বারে ভেজাইয়া দিই, পাছে পথিকে অত্যাচার সন্দেহ করিয়া থানায় খবর দেয়। পরিচিত ব্যক্তিরা আত্মীয়তা প্রকাশচ্ছলে আসিয়া, আমার কথিত কারণ শুনিয়া 'তা বটে তা বটে' বলিয়া মুখে চোখে সন্দেহের ছায়া লইয়া ফিরিয়া গিয়াছে। বাড়ীর লোকে অস্থির আর আমি উক্ত আর্তনাদপরায়ণার হতবুদ্ধি হতভাগ্য স্বামী একটা আস্ত চরখির মতো বাড়ীময় ঘুরিয়া মরিতেছি। পাঠক, সমস্তই বলিলাম কিন্তু আর্তনাদের কারণ বলিলাম না, তাই হয় তো এতক্ষণে তুমিও সন্দেহ করিতে সুরু করিয়াছ।

*   *   *   *

সাইকেলের বেল শুনিয়া বাহিরে আসিতেই দেখিলাম যে ডাক্তারবাবু সাইকেল হইতে নামিতে নামিতে বলিতেছেন—রুগী কেমন ?

আমি তো ভাল বুঝিনা।

ব্যথা ?

আগের মতোই।

হাঁ, তা তো চীৎকার শুনেই মনে হচ্ছে।

রোগটা কি মনে হয় ?

আমি তো গুরুতর কিছু মনে করি না, বাংলায় যাকে কানপাকা বলে তাই।

তাতে এত ব্যথা আর চীৎকার !

সেটা রুগীর উপরে নির্ভর করে, কেউবা মুখবুজে সহ্য করে, কেউবা অল্পেই বেশী ব্যথা অনুভব করে, এ রুগী 'হাইপারসেনসিটিভ'। চলুন রুগী দেখিগে যাই।

ডাক্তার দেখিয়া রুগী স্বরগ্রাম নিখাদের চূড়ান্তে তুলিয়া আর্তনাদ করিয়া উঠিল, ডাক্তারবাবু আর বোধহয় বেশিক্ষণ নেই।

ডাক্তারবাবু মৃদু হাসিয়া (ডাক্তারবাবুটির সব কথাতেই মৃদু হাসি, ওটাকে তিনি 'এসেটের' মধ্যে গণ্য করেন) বলিলেন, সে রকম আশঙ্কা করবেন না, আপনার শরীরে যথেষ্ট বল আছে।

কি ক'রে বুঝলেন ?

ডাক্তারবাবু বলিতে পারিতেন, আপনার ফুসফুসের শক্তি দেখিয়া, কিন্তু কিছুই না বলিয়া, একবার স্বভাবসিদ্ধ মৃদু হাসিয়া বিদ্যুতের আলো ফেলিয়া আমার সহধর্মিণীর কর্ণকুহর পরীক্ষা করিলেন। শেষে বলিলেন, আমি তো বিশেষ কিছু দেখি না।

তবে এটা কি ? বলিয়া রুগী বিকট আর্তনাদ করিয়া উঠিল।

আমি বলিলাম, তোমার ব্যথার অনুপাতে ব্যথার বোধ বেশী তাই—

না হইল আমার বাক্য শেষ, না পাইলাম তাহার উত্তর। রুগী ডাক্তারকে লক্ষ্য করিয়া বলিল ৩৪ লক্ষ পেনিসিলিন হ'ল।

আচ্ছা আর পাঁচ লাখ দিয়ে যাই, বলিয়া ডাক্তারবাবু ঔষধ ও যন্ত্রপাতির প্রতি মনোনিবেশ করিলেন।

* * * *

পাঠক এতক্ষণে বোধ হয় বুঝিতে পারিয়াছ যে আমি পাষণ্ড নই, আর দশজন স্বামীর মতোই ভালোয় মন্দে (স্ত্রী ছাড়া অপর সকলের কাছেই ভালো) মানুষ ; আমার স্ত্রীর কান পাকিয়াছে, আর তাহার ফলে পাড়ার কানে তালা লাগিবার উপক্রম। এই মফঃস্বল সহরে যতদূর সম্ভব হয় চিকিৎসার ত্রুটি করি নাই, ডাক্তার দিনে ৩।৪ বার আসে—এবং এই আশ্বাসও আমার স্ত্রীকে দিয়াছি যে প্রয়োজন হইলে কলিকাতায় লইয়া যাইব। কিন্তু স্বামীর সান্ত্বনা ও ডাক্তারের চিকিৎসা সত্ত্বেও রুগীর অবস্থার কিছুমাত্র তারতম্য ঘটে নাই। এমন একটানা আর্তনাদ এক মাত্র রণক্ষেত্রে সম্ভব, কিন্তু খুব সম্ভব তাহাও বোধ করি সমবেত চেষ্টা ছাড়া হয় না।

ইতিমধ্যে ডাক্তারবাবু ইনজেকশন সারিয়া জিনিষপত্র গুছাইতে গুছাইতে বলিলেন, এখন চল্‌লাম, ফিরবার পথে দুপুরবেলা না হয় একবার দেখে যাবো। মৃদু হাসিয়া ডাক্তারবাবু বিদায় হইলেন, রুগী নিরবচ্ছিন্ন সুযোগ পাইয়া আর্তনাদ করিতেই থাকিল।

* * *

বেলা এগারটা আন্দাজ ডাকঘরের পিওন যখন ভারিগলায় হাঁকিল, পার্শ্বেল বুঝিলাম যে আমার স্ত্রীর আর্তনাদ সনাথ কানের ব্যথা সত্ত্বেও সংসার চক্র তাহার অভ্যস্ত পথেই চলিতেছে। থানাপুলিশ, রেলষ্টীমার, ডাকঘর, আদালত, হাটবাজার, ইস্কুল কলেজ হইতে নেহরুর বক্তৃতা আপন পথ হইতে চুলমাত্র বিচ্যুত হয় নাই।

কি পার্শ্বেল বলিয়া উঠিয়া গেলাম। আলীহোসেন বলিল, ইনশিওর।

আমার নামে একটা ইনশিওর করা ছোট বাক্স আসিয়াছে, যথারীতি সই করিয়া গ্রহণ করিলাম।

ওটা আবার কি এলো? বলিল আর্তনাদের ক্ষণিক অবকাশে আমার স্ত্রী।

কি জানি কি, পরে দেখা যাবে, বলিয়া বাক্সটা টেবিলের উপরে রাখিয়া দিলাম।

দেখোনা, দেখোনা, কি এলো? ভাবিলাম হয় তো শাপে বর হইল, এই ব্যাপারটার দিকে মন গেলে আর্তনাদে সাময়িক ভাটাপড়া হয়তো অসম্ভব না হইতেও পারে। কাজেই আশু হস্তে বাক্স খুলিয়া ফেলিলাম, সম্পূর্ণ খুলিবার আগেই বিষয়বস্তু বুঝিতে পারিলাম, বলিলাম, রথীনকে (আমার ভাই) কল্‌কাতা থেকে তোমার জন্য যে কদমফুলি দুল পাঠাতে লিখেছিলাম, বোধহয় তাই এলো।

দেখি কি, দেখি কি—বলিয়া 'উঠিয়া বসিল রোগী শয্যার উপরে।' তিন দিবস পরে এই তাহার প্রথম গাত্রোত্থান।

আমি বিরক্ত হইয়া বলিলাম, আবার ব্যথা ট্যথা বাড়িয়ে এক কাণ্ড করে বসবে। এখন থাক সারলে পরো।

আর সেরেছে, আর পরেছি।

বাক্সটা ইতিমধ্যে হস্তান্তরিত হইয়াছে। তিন দিনের উপবাসী মরণাপন্ন রুগী একটানে কাঠের বাক্স ও তস্য বন্ধন, কাগজের বাক্স ও তস্য রহস্য মোচন করিয়া ফেলিয়া দোদুল্যমান দুটি কদমফুলি দুল আবিষ্কার করিয়া ফেলিল।

স্ত্রী বলিল—যাই বলো রথীনের রুচি আছে, আর জিনিষটাও বেশ ভারি।

আমি শুধু মনে মনে ভাবিলাম টাকা যে রথীনের নয়।

প্রকাশ্যে বলিলাম, ও কেউ নেবেনা, এখন রেখে দাও, কান সারলে পরো।

মুখের জিনিষ রেখে দিতে নেই, বলিয়া সহিষ্ণুতার প্রতিমূর্তিরূপা নারী দুল দুটি কানের (যে কানে তিন দিন আজ পাখীর পালক অবধি স্পর্শ করাবারও উপায় ছিল না) যথাস্থানে সন্নিবিষ্ট করিল।

বিস্ময় চাপিয়া রাখিয়া বলিলাম নাও এখন শুয়ে পড়ো।

আমি শুয়ে থাকলেই তো বাঁচো—এই বলিয়া তিনদিনের আসন্নমৃত্যু রোগী উঠিয়া আয়নার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল।

যাই বলো রথীনের টেষ্ট আছে। ওকি আবার যাও কোথাও?

পাশের বাড়ীর নতুনদিকে দেখিয়ে আসি, তিনি যে বলেছিলেন…

কিন্তু তোমার যে গুরুতর অসুখ।

আমার গুরুতর অসুখ হ'লেই তো তোমার দিব্যি মজা।

এই বলিয়া ঘৃণাপূর্ণ ধিক্কারপূর্ণ একটা দৃষ্টি আমার দিকে নিক্ষেপ করিয়া সহধর্মিণী নতুনদির উদ্দেশ্যে প্রস্থান করিল।

* * * *

বেলা বারোটা আন্দাজ 'চীৎকার শুনছিনে কেন' বলিতে বলিতে ডাক্তারবাবু ঘরে ঢুকিয়া বিস্ময়ে বলিয়া উঠিল কই, রুগী কই।

আমি উত্তর দিবার আগেই মূর্তিমতী উত্তর অন্য দ্বারপথে আবির্ভূতা হইল।

ডাক্তারবাবু অধিকতর বিস্ময়ে বলিয়া উঠিলেন একি ব্যথা সারলো কি ক'রে? আমি নীরবে এবং কিঞ্চিৎ ভয়ে ভয়ে কানের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিলাম—

বলিলাম, গোল্ড ইনজেকশন। আমার কথায় ডাক্তারবাবুর মৃদুহাসি অট্যহাস্তে ফাটিয়া পড়িল, বলিলেন আমাকেই দিতে হবে ভেবেছিলাম, তা আপনিই দিলেন, ভালই হয়েছে।

আপনারা তো বিশ্বাস করবেন না আমার কানের কি ব্যথা। বলিয়া রুগী স্থান ত্যাগ করিল, পাড়ায় এখনো অনেকগুলি দিদি বৌদিকে দেখানো বাকি। সত্যই আমরা বিশ্বাস করিতে পারিলাম না তাহার কানের কি ব্যথা।

রামায়ণের নূতন ভাষ্য

অভিরামবাবু একজন মনীষী ব্যক্তি। তাঁহার মনীষা যেমন তীক্ষ্ণ, তেমনি শক্ত, অনেকটা মহিষের শিঙের মতো। উক্ত বস্তুর আঘাতে তিনি যে-কোন সমস্যাকে ধরাশায়ী করিতে সক্ষম। এমন অনেক ভূপতিত সমস্যার প্রাণহীন দেহে তাঁহার গতিবিধির পথ আকীর্ণ। তাঁহার কৃপাতেই প্রথম বুঝিলাম যে ডেপুটি বঙ্কিম চট্টোপাধ্যায় যথোচিত প্রোমোশন না পাইবার ফলেই ইংরাজ সরকারের ন্যায়পরতা সম্বন্ধে সন্দিহান হন, আর এ হেন সরকারের উচ্ছেদ কামনা করিয়া আনন্দমঠ উপন্যাস রচনা করেন।

আবার তাঁহার কৃপাতেই প্রথম বুঝিলাম যে মাইকেল নিরন্তর ঋণভারে পীড়িত ছিলেন বলিয়াই ব্রজাঙ্গনা কাব্য লিখিয়াছিলেন। দু'য়ে যোগাযোগ ভালো বুঝিলাম না, রাধাবিরহ ও অর্থবিরহ কোন সূত্রে যে যুক্ত তিনিও খুলিয়া বলিলেন না, আমিও শুধাইতে সাহস পাইলাম না। মনীষী ব্যক্তিদের একটি অপরিহার্য লক্ষণ ক্রোধ। অভিরামবাবুতেও সে লক্ষণ ছিল। তাই তিনি যা বলিতেন নীরবে পরিপাক করিতাম।

অতঃপর একদিন অভিরামবাবু নাসারন্ধ্রদ্বয় প্রচুর নস্যচূর্ণে পূর্ণ করিয়া কিঞ্চিৎ সানুনাসিক স্বরে বলিলেন, হৃদয়বাবু আপনাদের রবি ঠাকুরের এই কবিতাটির মর্ম বুঝ্‌তে পারেন ?

তারপরে আমার উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া অধিকতর সানুনাসিক স্বরে আবৃত্তি আরম্ভ করিলেন—

"আমার কাছে রাজা আমার রইলো অজানা।
তাই সে যখন তলব করে খাজনা
মনে করি পালিয়ে গিয়ে দেবো তারে ফাঁকি,
রাখবো দেনা বাকি—
তাই জেনেছি ঋণের দায়ে
ডাইনে বাঁয়ে
বিকিয়ে বাসা নাইকো আমার ঠিকানা।"

আবৃত্তি শেষ করিয়া শুধাইলেন, বলুন এঁর অর্থ কি?

অবশ্য একটা অর্থ জানিতাম, কিন্তু সে অর্থ যে অভিরামবাবুর পরিকল্পিত অর্থ নয় তাহাও জানিতাম, তাই বলিলাম—আপনিই বলুন।

রবীন্দ্রনাথ জমিদার বলেই আপনাদের ভগবানকে জমিদাররূপে কল্পনা করেছেন, বুঝলেন না?

অবশ্যই বুঝিলাম, নতুবা তর্ক উঠিয়া অফিসের বেলা অতিক্রান্ত হইবে। সেদিন আমার ভাগ্য ভালো ছিল, তাই অভিরামবাবু জমিদার রবীন্দ্রনাথ ও জমিদার শ্রীভগবান্ সম্বন্ধে অধিক বাগ্‌বিস্তার না করিয়াই প্রস্থান করিলেন।

কয়েকদিন পরে অভিরামবাবু এক তাড়া কাগজ হাতে মদীয় নিবাসে উপস্থিত হইয়া বিনা ভূমিকায় বলিলেন—একটি প্রবন্ধ লিখেছি।

আমি মনে মনে শঙ্কা মানিয়া বলিলাম, অফিসের বেলা হ'ল যে।

তিনি সে কথায় কর্ণপাত মাত্র না করিয়া বলিলেন, রামায়ণের একটি নূতন ভাষ্য রচনা করেছি।

আমি মুখে কৃত্রিম উল্লাস সঞ্চার করিয়া বলিলাম, বেশ তো সন্ধ্যাবেলা শোনা যাবে।

নিন শুনুন। অবশ্য এখন সারমর্ম বলবো, সন্ধ্যাবেলায় প্রবন্ধটি প'ড়ে শোনাবো।

পড়িয়া রহিল অফিস ও অফিসের বেলা।

নিশ্চয়ই স্বীকার করেন যে মানুষের ইতিহাস Thesis, Antithesis ও Synthesis-এর তিন চাকায় ভর ক'রে চলে।

স্বীকার করিলে আলোচনা সংক্ষিপ্ত হইবে আশায় বলিয়া উঠিলাম, নিশ্চয়, নিশ্চয়।

রামচন্দ্র হচ্ছেন কৃষি সভ্যতার প্রতিনিধি, সে হচ্ছে থিসিস। আর রাবণ হচ্ছে যান্ত্রিক সভ্যতার প্রতিনিধি, সে হচ্ছে এন্টিথিসিস্। এবারে বলুন তো সিন্‌থিসিস কি? বলিয়া সগর্বে আমার দিকে চাহিলেন।

আমাকে নিরুত্তর দেখিয়া তিনি সদম্ভে বলিয়া উঠিলেন,

"অতঃপর খুশী হ'য়ে পবন নন্দন
বাহির করিল লেজ সহস্র যোজন।"

হনুমান হচ্ছে রাম রাবণের সিনথিসিস, বুঝলেন না? হনুমান।

এবম্প্রকার সিনথিসিসের জন্য আমি আদৌ প্রস্তুত ছিলাম না, তাই স্বভাবতই বিস্ময়ে নীরব রহিলাম।

তখন তিনি পুনরায় সুরু করিলেন, রাম কৃষি সভ্যতা থিসিস্, রাবণ যান্ত্রিক সভ্যতা এন্টিথিসিস্, হনুমান এ দুয়ের মিলন—সিনথিসিস্।

কিন্তু এ দুয়ের মিলন বল্‌তে কোন্ সভ্যতা বোঝায়?

এ আর বুঝলেন না! টেকনোক্র্যাসি, হনুমান হচ্ছে টেকনোক্র্যাট, মহাকারিগর, কাজেই সে এ দুয়ের সমন্বয় বা সিনথিসিস।

বলেন কি মশায়, রামায়ণ তো ভক্তিরসের কাব্য।

ও সব আপনাদের কাছে। আপনারা সাহিত্য বিচার করেন, প্রেম, ভক্তি প্রভৃতির দূরবীক্ষণ দিয়ে, আর আমরা মানে প্রগ্রেসিভগণ বিচার

করি অর্থনীতির অণুবীক্ষণ বাগিয়ে। মশায় জগৎটা অর্থনীতির তেজি-মন্দিতে তালে তালে পা ফেলে চলছে। সেই চলার পথের ছন্দকেই বলে থিসিস্‌, এন্টিথিসিস্‌, ও সিনথিসিস্‌, বুঝলেন।

কিন্তু তখন আর হাঁ, না বলিবার তত আবশ্যক ছিল না, কারণ অফিসের বেলা বহুক্ষণ অতিক্রান্ত। অতঃপর তিনি প্রকাণ্ড এক টিপ নস্য গ্রহণ করিয়া প্রস্থান করিলেন। আর আমার মনের মধ্যে রামায়ণের নূতন ভাষ্য 'বাহির করিল লেজ সহস্র যোজন।'

ক'দিন আর অভিরামবাবুর দেখা নাই, ভাবিলাম একদিন সন্ধান লইব। এমন সময়ে উভয়ের পরিচিত এক বন্ধুর সঙ্গে সাক্ষাৎ।

হাঁ মশায়, অভিরামবাবুর খবর কি?

জানেন না বুঝি?—ভদ্রলোক বড়ই বিপন্ন।

কি রকম?

ওঁর স্ত্রী ঘর ছেড়ে গৈরিক ধারণ ক'রে—মঠে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছেন।

হঠাৎ?

হঠাৎ নয়। অভিরামবাবু যেমন প্রচণ্ড নাস্তিক, ওঁর স্ত্রীর তেমনি ধর্মের প্রবল টান। শেষে আর স্বামীকে সহ্য করতে না পেরে ভদ্র মহিলা মঠে গিয়ে উঠেছেন।

শুনিয়া দুঃখিত হইলাম, আর তখনই মনে পড়িল, থিসিস্‌ ও এন্টিথিসিস্‌। কিন্তু সিনথিসিস্‌ও যে হাতের কাছে প্রস্তুত ছিল তাহা কি জানিতাম!

আরও বিপদ কি জানেন! ওঁর একমাত্র সন্তান পুত্রটিও নিরুদ্দেশ।

কোথায় গেল?

কেউ জানে না। কিম্বা যে জানতো সেও নিরুদ্দেশ।

কে?

পাড়ার একটি মেয়ে।

দু'জনে একসঙ্গে গেছে?

যোগাযোগ দেখে তাই মনে হয়।

শুধু হাতে ছেলেটি নিরুদ্দিষ্ট হ'ল?

একেবারে শুধু হাতে নয়। বাপের টাকাকড়ি ও মায়ের অলঙ্কার কিছুই রেখে যায় নি। আচ্ছা, এখন আসি। আর এক সময়ে এসে বিস্তারিত খবর দিয়ে যাবো।

বুঝিলাম যে অভিরামবাবুর ভাষ্য কেবল রামায়ণ সম্বন্ধেই সত্য নয়, তাঁর নিজ পরিবার সম্বন্ধেও সমান প্রযোজ্য। কেননা স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে পিতা অভিরামবাবু নাস্তিক্যের প্রতিনিধি তিনি থিসিস্, মাতা ধর্মের প্রতিনিধি তিনি এণ্টিথিসিস্—আর পুত্র প্রেমের প্রতিনিধি সে সিনথিসিস্। আর এ সবের মূলে অর্থনীতির ধাক্কাটাও সক্রিয়—পুত্র যাইবার সময় টাকাকড়ি ও অলঙ্কার লইতে ভোলে নাই। বুঝিলাম যে অভিরামবাবুর মনীষা ও ভাষ্য সত্যই আসল বস্তুকে বহুদূর ছাড়াইয়া গিয়াছে—তাহা ঐ হনুর লেজের মতোই বিপুল রহস্যময়। মাথার মধ্যে ক্রমাগত পাক হইয়া ঘুরিতে লাগিল—

"অতঃপর খুশী হয়ে পবন নন্দন
বাহির করিল লেজ সহস্র যোজন।"

ওরে বাবা অতবড় জ্যোতিষী কল্‌কাতা সহরে আর নেই।

কই নাম তো শুনিনি।

নামের কাঙাল তিনি নন, তাছাড়া তিনি যে প্রফেশনাল নন।

বেশ তো একদিন নিয়ে চলুন না।

যেদিন খুশী চলুন। তবে আগে নোটিশ দিয়ে না গেলে ফিরে আসতে হ'তে পারে।

এত ভিড়।

হবে না! মন্ত্রী, উপমন্ত্রী থেকে বড় বড় অফিসার সব কিউ দিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন।

বলেন কি!

যা দেখেছি তাই বলছি। যিনি যত বড়ই হোন জ্যোতিষী, ডাক্তার আর মহাজনের কাছে সবাই অসহায়।

তাহলে নিয়ে যেতে চাচ্ছেন কোন্ ভরসায়?

আমাদের সঙ্গে তাঁর অনেকদিনের সম্বন্ধ, বিশেষ স্নেহ করেন আমাকে।

তবে আর দেরী নয় চলুন।

এই বলিয়া তিনজনে উঠিয়া পড়িলাম।

উপরোক্ত সংলাপ হইতে বুদ্ধিমান্ পাঠক নিশ্চয়ই এতক্ষণে ব্যাপারটা বুঝিতে পারিয়াছেন। আর দু' একটা কথা বলিলেই সমস্ত পরিষ্কার হইয়া যাইবে।

জ্যোতিষীর মহিমা কীর্তন যিনি করিতেছেন তিনি আমাদের সঙ্গে সামাজিক সূত্রে পরিচিত, আর আমরা দুইজনে সাহিত্যিক।

২

তিন জনে আমরা যখন জ্যোতিষীর খাস কামরায় প্রবেশ করিলাম, দেখিলাম সত্যই কয়েকজন লোক সেখানে উপবিষ্ট। তবে তাহাদের কাহাকেও মন্ত্রী বা উপমন্ত্রী বলিয়া মনে হইল না। অবশ্য তাহাদের চেহারা-চরিত্র, কথাবার্তা ও হাবভাব যে রকম তাহাতে অচির ভবিষ্যতে তাহাদের কেহ বা কেহ কেহ মন্ত্রীপদ পাইলে অন্ততঃ আমি তো বিস্মিত হইব না!

আর একদিকে ঐ যে একাকী যিনি নিঃসঙ্গ মহিমায় বিরাজিত তিনিই নিঃসন্দেহে কলিকাতার শ্রেষ্ঠ জ্যোতিষী যাহার কাছে মন্ত্রী ও বাছা বাছা অফিসারগণ অসহায় বোধ করিয়া থাকেন। এ হেন মহিমময় পুরুষের মুখমণ্ডলে যে দিব্য দীপ্তি সকলে আশা করিয়া থাকে তেমন কিছু দৃষ্টিগোচর হইল না, কিন্তু কলিযুগের শেষপাদে আশানুরূপ কয়টা কার্য হইয়া থাকে। ক্ষণকাল তরে মনে হইল তাঁহার মস্তকে একটা কিসের যেন আভা! না, উহা প্রচুর তৈলনিষিক্ত কেশদামে বৈদ্যুত বর্তিকার প্রতিফলন মাত্র। একবার মনে হইল তাঁহার ত্রিকালদর্শী চক্ষুদ্বয়ে কিসের যেন দীপ্তি! না, পরে, হায় অনেক পরে বুঝিয়াছিলাম উহা দর্শক সমাগমজনিত আনন্দ কৌতুক। একবার মনে হইল, না, আর মনে হইবার সংখ্যা বাড়াইয়া লাভ নাই।

অপরেশবাবু, যাঁহার সঙ্গে আসিয়াছি, বলিলেন—স্যার এঁদের নিয়ে এলাম। এঁরা খুব বড় সাহিত্যিক।

এই বলিয়া এ পর্যন্ত যে-সব পুস্তক আমরা লিখি নাই বা কখনো লিখিব এমন ক্ষীণতম ইচ্ছাও নাই সেই সব গ্রন্থের গ্রন্থকার বলিয়া আমাদের বর্ণনা করিলেন।

নমস্কার, বসুন, বসুন।

ভাবী মন্ত্রী-উপমন্ত্রীর দল চেয়ার ছাড়িয়া দিয়া প্রস্থান করিল, আর আমরা, কিনা ভাবী বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের দল উপবেশন করিলাম।

চা আনতে বলবো?

না, না, থাক।

বেশ তবে থাক। বুঝলেন অপরেশবাবু, কাল অনেক রাত্রে দিল্লী থেকে ট্রাঙ্ক কল্ একজন কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর কাছে থেকে।

হঠাৎ?

হঠাৎ! এরই তো অপর নাম অদৃষ্ট! নেহরু নাকি তাঁকে ক্যাবিনেটে রাখতে চান না। কি হবে জানতে চান। আমি বললুম—মা ভৈঃ আপনি থাকবেনই।

আশ্চর্য!

এ অতি সাধারণ ব্যাপার। কিন্তু আজ সকালে যা ঘটেছে—তার মধ্যে কিছু বৈশিষ্ট্য আছে।

আবার কি হ'ল?

এক মস্ত মাড়োয়ারী ব্যবসায়ী কাঁদতে কাঁদতে এসে হাজির, শেয়ারের দর পড়ছে, এখন কি করবে জানতে চায়। আমি একটু চিন্তা ক'রে বল্লাম, আজ দুপুরেই দর চড়তে সুরু করবে, রামজীর নাম ক'রে বাড়ী ফিরে যান।

চড়েছে?

চড়েছে বলে চড়েছে। এই দু'ঘণ্টা আগে কোন ক'রে হাজার হাজার সুক্রিয়া জানিয়েছেন।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ও মাড়োয়ারী ব্যবসায়ীর তুলনায় নিজেদের নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর বোধ হইতে লাগিল, দুইজনে হতবাক্ হইয়া মূঢ়ের মতো বসিয়া রহিলাম।

কিন্তু অতঃপর যে কাণ্ড আরম্ভ হইল তাহার দাপটে হতবুদ্ধি হয় না এমন লোক স্বর্গধামে থাকিলেও মর্ত্যলোকে নাই। জ্যোতিষী কৃষ্ণচরণবাবু তাঁহার ভক্ত অপরেশবাবুকে বিশ্বের যাবতীয় সম্ভাবনা সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল করিতে লাগিলেন, তাহারই ছিটেফোঁটাতে আমাদের সাষ্টাঙ্গ সিক্ত হইয়া গেল। বরাবর একটা ব্যাপার লক্ষ্য করিয়াছি যে জ্যোতিষীগণ ভবিষ্যৎ গণনায় যেমন উদার ভূতকাল গণনায় ততটা নহেন। এ ক্ষেত্রেও তাহার ব্যতিক্রম ঘটিল না। আগামী বিশ্বযুদ্ধ কবে বাধিবে, কোন্ কোন্ পক্ষে কোন্ কোন্ রাষ্ট্র থাকিবে, ভারত নিরপেক্ষ কিম্বা মুখাপেক্ষী থাকিবে দেখিলাম সমস্তই কৃষ্ণচরণবাবুর নখদর্পণে। মনে হইল কিছুক্ষণের জন্য বিধাতার সেক্রেটারিয়েট স্বস্থান পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার চেম্বারে আশ্রয় লইয়াছে। ঘণ্টাখানেক এইরূপ চলিবার পরে তিনি উঠিলেন, কাজেই আমরাও উঠিলাম।

বাহিরে আসিলে আমি অত্যন্ত সন্তোষের সঙ্গে বলিলাম—একটু চা খেলে হ'তনা?

বেশ তো চলুন।

আমরা কৃতার্থ বোধ করিলাম, বিশ্বের অন্ধিসন্ধির রহস্য যাঁহার নোটবুকে তিনি আমাদের নিমন্ত্রণে চা পান করিতে রাজি হইয়াছেন—এ যে মহতের লীলা।

একটি আভিজাত্য সম্পন্ন রেস্তোরায় গিয়া চারজনে বসিলাম।

অল্পক্ষণের মধ্যেই বুঝিতে পারিলাম যে কৃষ্ণচরণবাবুতে মহাপুরুষোচিত অনেক লক্ষণই বর্ত্তমান, এবং আমিষ নিরামিষে সমদৃষ্টি। ভোজনান্তে যখন উঠিলাম তখন তাঁর উদরপূর্ত্তির সূত্রে অনেককয়টি রজত মুদ্রা বাহির হইয়া গিয়াছে। বৃষ্টি পড়িতেছিল, এত বড় জ্যোতিষীকে তো তখন ট্রামে বাসে বিদায় করিয়া দেওয়া যায় না—তাই ট্যাক্সি ভাড়া করিয়া তাঁহার স্বনিকেতনে পৌঁছাইয়া দিলাম। বাড়ী ফিরিবার সময়ে আমাদের প্রথম সম্বিৎ ফিরিয়া আসিল, মনে হইল যে উদ্দেশ্যে গিয়াছিলাম, নিজেদের ভাগ্যগণনা সে সম্বন্ধে একটি প্রশ্নও করা হয় নাই। কিছুই আশ্চর্য্য নয়। মহাপুরুষ সঙ্গ আত্মপ্রসঙ্গ ভুলাইয়া দেয়—ঐখানেই তো তাঁহাদের মাহাত্ম্য।

দুই বন্ধু বাড়ী ফিরিলাম। দেখিলাম যে আমার বৈঠকখানার তক্তপোষের উপরে সকালবেলাকার সংবাদপত্রখানা পড়িয়া আছে। প্রথম নজরেই চোখে পড়িল—'এ সপ্তাহের ফলাফল।' মীন রাশির অর্থক্ষয়, আমার মীন রাশি। মেষ রাশি 'প্রবঞ্চকের হাতে পড়িবে'—বন্ধুর মেষ রাশি। আমাদের দুইজনের মুখে সমস্বরে বাহির হইল—'শেষ পর্য্যন্ত জ্যোতিষের গণনাই সত্যি।' টাকা কয়টি বৃথা খরচ হয় নাই ভাবিয়া একপ্রকার সান্ত্বনা পাইলাম।

অলঙ্কার

বিবাহের পরদিন যমুনা শ্বশুর গৃহে রওনা হইতেছে। পাল্কীতে উঠিবার সময়ে অশ্রুমুখী জননী তাহাকে বলিলেন—মা, স্ত্রীলোকের শ্রেষ্ঠ সম্পত্তি সতীত্ব ও অলঙ্কার। এ ছুটি বস্তু সযত্নে রক্ষা করো।

যমুনা কাঁদিতে কাঁদিতে রওনা হইল—আর জননীর কথা ছুটি ঘুরিয়া ফিরিয়া তাহার মনের মধ্যে পাক খাইতে লাগিল—সতীত্ব ও অলঙ্কার স্ত্রীলোকের শ্রেষ্ঠ সম্পত্তি—এ ছুটি সযত্নে রক্ষা করো।

যমুনাকে যাঁহারা দেখেন নাই তাঁহারা বুঝিবেন না ছুটি রক্ষণীয় বস্তুর মধ্যে প্রথমটি হারাইবার কিছুমাত্র আশঙ্কা তাহার ছিল না। এরূপ কুৎসিত ও মুখরা রমণী বিধাতা বোধ করি একটির অধিক সৃষ্টি করেন নাই। তাই সে প্রথমটি সম্বন্ধে বেশ নিশ্চিন্ত হইয়া দ্বিতীয়টির রক্ষায় মন দিল।

শ্বশুরগৃহে আসিবার অল্প পরেই যমুনার শাশুড়ী ঠাকুরাণী পরলোকগমন করলেন। যমুনা তখন বাড়ির সর্ব্বময় কর্ত্রী হইয়া বসিল—সংসারে রহিল কেবল তাহার স্বামী ও সে নিজে। সাধারণতঃ সংসারে ছু'চার জন ঝি-চাকরও থাকে, যমুনার সংসারে ছিলও বটে, কিন্তু তাহার মুখের ধারে পুরাতন লোক একে একে সরিয়া পড়িল, নূতন লোক আসিল না। কাজেই যমুনা মনের সুখে নিঃসপত্ন রাজত্ব করিতে লাগিল। ছুটি প্রাণীর সংসারে কাজ-কর্ম্ম অল্প বিধায় জননীর আদেশ পালনে সে উদ্যত হইল। স্ত্রীলোকের সতীত্ব সম্বন্ধে আলোচনা ভদ্র-নিয়ম-বহির্ভূত, কাজেই তাহাতে প্রবৃত্ত হইতে চাহি না, শুধু

এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে তাহার পতি-দেবতাও তাহার সতীত্ব রক্ষা করিয়া চলিতেন। দ্বিতীয়টির সম্বন্ধে আলোচনায় বাধা নাই—বস্তুতঃ সেই আলোচনাই এ গল্পটি।

যমুনা শ্বশুরগৃহে একটি লোহার সিন্দুক পাইল—সেই সিন্দুকের অন্ধকার গর্ভে সযত্নে অলঙ্কারগুলি রক্ষা করিয়া কুলুপ আঁটিয়া তাহা সন্তর্পণে বাঁধিল। পাল-পার্ব্বণ উপলক্ষ্যেও অলঙ্কারগুলি সে বাহির করিত না—এমনি সতর্কতা।

২

একবার সদর খাজনা দাখিলের সময়ে কিছু টাকার টানাটানি পড়ায় যমুনার স্বামী নরেশ বলিল, দু'চারখানা গহনা দাও, ধান উঠলেই ফিরিয়ে দেবো।

যমুনা জননীর উপদেশের শেষাংশ আবৃত্তি করিয়া বলিল—অলঙ্কার স্ত্রীলোকের শ্রেষ্ঠ সম্পত্তি, ও দিতে নেই।

এ সম্পত্তিও যে তোমার, খাজনার দায়ে যায় যে!

তার আমি কি করবো।

তবে টাকা কোথায় পাই?

ধার ক'রো গে, না পাও চুরি ক'রো গে—বলিয়া সে প্রস্থান করিল।

ধার ও চুরি কিছুই সম্ভব না হওয়ায় নরেশের একখানা তৌজি সেবারে নীলাম হইয়া গেল।

যমুনা ভাবিল সর্ব্বনাশ! সম্পত্তি তো গেলই, সঙ্গে অলঙ্কারও যাইত। সেই অভিজ্ঞতায় সে স্থির করিয়া ফেলিল যে কখনো কোন ছলনাতেই আর অলঙ্কার দিবার নামটিও করিবে না।

পাঁচ সাত বছর পর পর অজন্মা ও বন্যা প্রভৃতি হওয়ায় সম্পত্তি হইতে রীতিমতো খাজনা আদায় হইল না আর সদর খাজনার দায়ে একে একে সবগুলি তৌজি নীলাম হইয়া যাওয়ায় নরেশ প্রায় সর্ব্বস্বান্ত হইল। নিতান্ত বিপন্ন হইয়া আরো দু'একবার সে স্ত্রীর কাছে হাত পাতিয়াছে আর উত্তর শুনিয়াছে যে সম্পত্তির সঙ্গে আমার অলঙ্কার-গুলোও যাক্—এই তো চাও। সেটি হবে না।

অবশ্য কথাগুলি ঠিক এই ভাষায় কথিত হয় নাই—সে ভাষা একমাত্র যমুনার আয়ত্ত হওয়ায় অপরের পক্ষে তাহার ব্যবহার সম্ভব নয়।

অবশেষে সর্ব্বস্বান্ত ভগ্ন-হৃদয় নরেশ কঠিন পীড়ায় পড়িল। গাঁয়ের ডাক্তার দু'চারদিন চিকিৎসা করিয়া যমুনাকে বলিল—মা, রোগের অবস্থা ভালো মনে হচ্ছে না, সদর থেকে ডাক্তার আনিয়ে চিকিৎসা করান।

সে যে অনেক টাকার দরকার।

দু'চারখানা অলঙ্কার বেচুন, স্বামী স্ত্রীলোকের শ্রেষ্ঠ সম্পত্তি।

যমুনা ইহার বিপরীত উপদেশ পাইয়াছে। তাই বলিল—দেখি কি করা যায়।

অর্থাৎ, অলঙ্কার রক্ষা ছাড়া আর কিছুই করণীয় নাই ইহাই তাহার মনোগত ভাব।

তারপরে যথাকালে অর্থাৎ কালপূর্ণ হইবার অনেক আগেই যমুনার সযত্ন-রক্ষিত অলঙ্কারের স্তূপ কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ না করিয়া নরেশ পরলোকে প্রস্থান করিল।

যমুনা আন্তরিক দুঃখে কাঁদিল, কিন্তু কোন্ কালোমেঘে না সুবর্ণের রেখা আছে। গভীর দুঃখের মধ্যে মুহুর্মুহু তাহার মনে উদিত হইতে

লাগিল—সংসারে আর কিছু না থাক্ স্ত্রীলোকের শ্রেষ্ঠ সম্পত্তি অলঙ্কারগুলি তো অন্ততঃ আছে। অমনি একপ্রকার অপ্রত্যাশিত সান্ত্বনা সে অনুভব করিল। সংসার সত্যই সুখের স্থান!

সকলে বলিল, নরেশবাবু একটা দিক্‌পাল ছিলেন, শ্রাদ্ধাদি যোগ্যমতে করুন।

সদ্য বিধবা বলিল—টাকা কোথায়?

একজন বলিল, দু'চারখানা অলঙ্কার বেচুন—এই তো সময়!

যমুনা যাহা ভাবিল মুখে তাহা উচ্চার্য্য নয়।

নমো নমো করিয়া নরেশবাবুর শ্রাদ্ধাদি হইয়া গেল।

যমুনার ভাই আসিয়া বলিল, দিদি আর কেন? এবারে চলো একটা সহরে গিয়ে বাস করি।

যমুনা বলিল, আমার কি অসাধ! কিন্তু সাধ্য কই!

কেন, তোমার তো প্রচুর অলঙ্কার আছে, বিক্রি করো।

মা উপদেশ দিয়েছিলেন অলঙ্কার বেচতে নাই।

ভাই নিরাশ হইয়া ফিরিয়া গেল।

যমুনা গ্রামেই রহিল আর কায়ক্লেশে দিনাতিপাত করিতে লাগিল।

মাঝে মাঝে পড়শীরা আসিয়া বলিত, বউ এত কষ্ট করো কেন, কিছু ধানী জমি কিনে ফেল।

আমার অদৃষ্টে সে সুখ কি আছে ভাই—টাকা কোথায়?

কেন, কিছু অলঙ্কার বেচো।

না ভাই, ও করতে নাই।

সিন্দুকে প্রচুর অলঙ্কার সযত্নে রক্ষা করিয়া যমুনা শাকান্নে জীবন ধারণ করিতে লাগিল।

যমুনার অভ্যাস ছিল বিজয়া দশমীর দিনে সিন্দুক খুলিয়া অলঙ্কার-

গুলিতে শান্তিজল ছিটাইত আর নয়ন ভরিয়া সেগুলি নিরীক্ষণ করিয়া নারী-জন্ম ধন্য করিত। জীবনে ঐ দিনটি তাহার চরম সুখের—সেই সুখে সারা বছরের অভাব ও ক্লেশ ভুলিয়া যাইত।

সেদিন বিজয়া দশমীর সন্ধ্যায় নিয়মিত প্রদীপ ও শান্তির জল হাতে সিন্দুক সমীপে উপস্থিত হইয়া সিন্দুকটি খুলিয়া ফেলিল। কিন্তু একি! গহনার বাক্সটি কোথায়? ক্ষীণ দীপালোকের উপরে ভরসা না করিয়া একটি লণ্ঠন আনিয়া ফেলিল—প্রদীপ ও লণ্ঠন দু'য়েরই সাক্ষ্য এক, গহনার বাক্স নাই—তার স্থানে খান তিনেক থান ইঁট। যমুনা পাগলের মতো ইঁটগুলায় টান মারিতেই এক টুকরা কাগজ চোখে পড়িল। লণ্ঠনের আলোয় দেখিল কাগজে কি লেখা! সে আশায়, আগ্রহে ও আশঙ্কায় পাঠ করিল—"মা ঠাকরুন্, গহনায় তোমার দরকার নাই, কেবল গহনা আছে এই বোধটাই যথেষ্ট। আমার বিশেষ দরকার। যে গহনা কখনও ব্যবহার করিলে না, কখনো করিবে মনে হয় না, তাহার মূল্য কি! তাই তাহার পরিবর্ত্তে তিন খানা থান ইঁট রাখিয়া গেলাম—মনে করো ঐ তোমার অলঙ্কার। বিশেষ ইতরবিশেষ হইবে না। ইতি নিদারুণ অভাবগ্রস্ত।"

চিঠি পড়িয়া সে উচ্চস্বরে ক্রন্দন করিয়া উঠিল—আর দেয়ালে মাথা কুটিতে কুটিতে বলিতে লাগিল—আঁটকুড়ের বেটা! আঁটকুড়ের বেটা! অলঙ্কারগুলি কে লইল, কেমন করিয়া লইল এ সব জটিল কথা ভাবিবার মতো তাহার মনের অবস্থা ছিল না। মাথা কুটিতে কুটিতে রক্ত পড়িয়া সে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া গেল। অনেক রাত্রে মূর্চ্ছা ভাঙিলে হঠাৎ ঐ চিঠিখানির উপদেশ একটি পরম তত্ত্বরূপে তাহার মনে উদিত হইল। সত্যই তো তাহার কি এমন ক্ষতি হইয়াছে! ঐ থান ইঁটগুলোর আর অলঙ্কারের কি তাহার কাছে সত্যই সমান মূল্য নয়! বাকি রাত্রিটুকু

ঐ তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিতে গেল। ভোররাত্রে ইঁটগুলা সযত্নে সিন্দুকে রাখিয়া সিন্দুকের ডালা বন্ধ করিল।

কয়েক দিন পরে তাহার একখানা ঘর পুড়িয়া গেল।

পড়শীরা বলিল—নতুন ঘর তোলো।

টাকা কোথায়?

এবার ২।১ খানা অলঙ্কার বেচো।

না ভাই, ও বস্তু বেচতে নাই, অলঙ্কার স্ত্রীলোকের শ্রেষ্ঠ সম্পত্তি।

পড়শীরা রাগিয়া উঠিয়া গেল—বলিয়া গেল, তবে সোনার তাল সিন্দুকে রেখে রোদে জলে ভিজে পুড়ে মরো।

যমুনা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, যার যেমন কপাল ভাই। অলঙ্কার হরণের আগে ও পরে তাহার জীবনে কোন বৈলক্ষণ্য ঘটিয়াছে এমন কেহ লক্ষ্য করিল না। যমুনার দিন আগের মতোই সুখে এবং আগেরই মতোই দুঃখে চলিতে লাগিল।

অদৃষ্ট-সুখী

কোন দেশে 'অদৃষ্ট-সুখী' নামে এক অন্ধ ব্যক্তি বাস করিত। সংসারে তাহার কোন অভাব ছিল না, তাহার প্রয়োজনাতিরিক্ত অর্থ ছিল, স্নেহময়ী পত্নী ছিল, সহানুভূতিসম্পন্ন আত্মীয় স্বজন ছিল, দাস দাসী প্রচুর ছিল। তবু তাহার মনে সুখ ছিল না। অন্ধব্যক্তি কবে সুখী? সংসারে অন্ধব্যক্তির যে-সব অসুবিধা হইয়া থাকে অদৃষ্ট-সুখীর তাহার কোনটিই ছিল না। সে দেখিতে পায় না বটে, কিন্তু যাহার দাস দাসী প্রচুর তাহার না দেখিবার অসুবিধা ভোগ করিতে হয় না। হাতে ধরিয়া চলাফেরা করাইবার লোকের তাহার অভাব ছিল না। সকালে বিকালে সে অশ্বযানে বেড়াইতে বাহির হইত, যখন যাহা প্রয়োজন চাহিবার আগেই তাহার জুটিত। সকলে বলিত লোকটা সুখী বটে। তাহার দৃষ্টির অভাব আর দশ রকম প্রাচুর্য্যের তলে চাপা পড়িয়া গিয়াছিল—লোকের চোখে পড়িত না। কিন্তু অদৃষ্ট-সুখীর মনে শান্তি ছিল না, সে ভাবিত কেবল যদি দৃষ্টি পাইতাম, আর কিছু চাহিতাম না। সে গম্ভীর মুখে বসিয়া থাকিলে তাহার স্নেহময়ী পত্নী আসিয়া মধুর কণ্ঠে শুধাইত, তুমি গম্ভীর হয়ে আছ কেন? কিসের তোমার অভাব? তাহার পিতা বলিত, বৎস, তোমার নামে আজ একটি নূতন সম্পত্তি কিনলাম। মাতা পুত্রবধূকে বলিত, বৌমা, তুমি একটু বাছার কাছে গিয়ে ব'সো না—তোমার সংসারের কাজের মধ্যে থাকবার প্রয়োজন কি? বন্ধুরা বলিত, ভায়া, এই নাও গোলাপ ফুলের তোড়া, তোমার নূতন বাগানের ফুল—এমন ফুল আমরা চোখে দেখি নাই।

অদৃষ্ট-সুখী বলিত—ভাই আমিও চোখে দেখি নাই—

বন্ধুরা বলিত, তা হলে আর তোমাতে আমাদের প্রভেদ কি?

তারপরে সান্ত্বনা দিয়া বলিত, চোখে দেখতে পেলেই কি লোকে

সুখী হয়? এই তো ও পাড়ার গোবিন্দ—চোখ তার দুটো বটে, কিন্তু চোখ দিয়ে দেখবার মতো একটা বস্তুও কি তার গৃহে আছে? সে না পায় খেতে, না পায় পরতে! ভগবান তোমার উপর খুশী নিশ্চয়!

অদৃষ্ট-সুখী ভাবিত, হায়, ভগবান খুশী হইলে আমার এমন দশা হইবে কেন? সে ভাবিত লোকে বলে আকাশ নীল, পৃথিবী সবুজ, দিবস উজ্জ্বল, রাত্রি নক্ষত্রময়, লোকে বলে আমার পত্নী সুন্দরী, আমার পিতা সুপুরুষ—কিন্তু আমার কাছে সবই অন্ধকার। ইহা কি ভগবানের খুশীর লক্ষণ? সে ভাবিত আমার মতো আর হতভাগ্য কে?

ক্রমে তাহার জীবন দুর্ব্বহ হইয়া উঠিল। আত্মহত্যা করিবে বলিয়া সে স্থির করিল—কিন্তু অন্ধের পক্ষে আত্মহত্যা করাও সহজ নয়, কারণ সে পরাধীন। তখন সে সঙ্কল্প করিল যে ভগবানের সাধনা করিয়া দেখিবে, সে শুনিয়াছে যে সাধনায় ভগবান খুশী হন, আর খুশী হইলে তিনি মানুষকে অভীষ্ট বরদান করিয়া থাকেন। তখন সে বাড়ীর বাগানের একটি আতাগাছের তলায় বসিয়া তপস্তায় মন দিল। তিন দিন তিন রাত্রির কঠোর তপস্তায় ভগবান সন্তুষ্ট হইয়া তাহার কাছে আসিয়া বলিলেন—বৎস, আমি খুশী হইয়াছি—তুমি বর প্রার্থনা করো।

অদৃষ্ট-সুখী তাহাকে প্রণাম করিয়া বলিল—ভগবান্, যদি সত্যই খুশী হইয়া থাকো, তবে আমাকে দৃষ্টি দাও।

ভগবান বলিলেন—বৎস, অন্য বর প্রার্থনা করো।

সে বলিল—আমার অন্য কিছুর অভাব নাই—

ভগবান বলিলেন—কত লোকের কত অভাব থাকে। তোমার একটিমাত্র অভাব—তবু তুমি সন্তুষ্ট নও কেন?

সে বলিল—আমার শত অভাব ঘটুক, কেবল দৃষ্টির অভাব পূরণ করিয়া দাও।

ভগবান বলিল—চোখে দেখিতে পাইলেই কি মানুষ সুখী হয়? বৎস, আমার কথা শোনো, সুখ দৃষ্টির উপরে নির্ভর করে না, কাজেই দৃষ্টি তুমি চাহিও না।

কিন্তু অদৃষ্ট-সুখী কিছুতেই ছাড়িবে না। মানুষের স্বভাব এই যে তাদের একটি মাত্র অভাব থাকিলেও সে অসুখী বোধ করে, সে ভাবে তাদের শত দুঃখ ওই অভাবটির রন্ধ্রপথে আসিতেছে। করায়ত্ত শত সুখ অনায়ত্ত একটি অভাবের চেয়ে ছোট মনে হয়।

ভগবান তাহাকে নাছোড়বান্দা দেখিয়া বলিলেন, বৎস, তুমি দৃষ্টি লাভ করিবে বটে কিন্তু সুখী হইবে কিনা বলিতে পারি না। কাল সকালে তুমি দৃষ্টি পাইবে। এই বলিয়া ভগবান অন্তর্হিত হইলেন। অদৃষ্ট-সুখী সন্তুষ্ট হইয়া বাড়ীর ভিতরে ফিরিয়া আসিল।

২

পরদিন প্রাতঃকালে অদৃষ্ট-সুখী চোখ মেলিবামাত্র সমস্তই দেখিতে পাইল। জগতের সহিত এই তাহার প্রথম শুভদৃষ্টি। শুভদৃষ্টি মাত্রই যে সুখ-দৃষ্টি নহে বিবাহিত ব্যক্তি মাত্রেই তাহা অবগত। অদৃষ্ট-সুখী চোখ মেলিয়া প্রথম কি দেখিতে পাইল? দেখিল তার পত্নী তখনও নিদ্রিত। সে দেখিতে পাইল, তাহার সুন্দরী পত্নীর নাকের নীচে অতি সূক্ষ্ম, অতি কোমল একটি গোঁফের রেখা। সে শুনিয়াছিল স্ত্রীলোকের গোঁফ, দাড়ি ওঠে না। তবে তাহার পত্নীর বেলায় এমন ব্যতিক্রম কেন? না সকলেরই এমন আছে? তাহার মনে হইল নিয়মই হোক আর ব্যতিক্রমই হোক ওই অতি সূক্ষ্ম, অতি কোমল লোমটি না থাকিলেই ছিল ভালো। ইহাই তাহার চোখের দৃষ্টির প্রথম অভিজ্ঞতা।

দ্বিতীয় অভিজ্ঞতা এই যে সে অন্যের সাহায্য ব্যতীত হাঁটিতে চেষ্টা

করা মাত্র পাঁচ সাত জন চাকর আসিয়া ধরিয়া ফেলিল—বলিল, এ কি দাদাবাবু প'ড়ে যাবেন যে।

দুই দিন পরে আর প্রয়োজন নাই বলিয়া যখন তাহাদের কর্ম্মচ্যুতি ঘটিল তাহারা প্রকাশ্যে অদৃষ্ট-সুখীকে নিমকহারাম বলিয়া গালি দিয়া চলিয়া গেল, সংসারে কৃতজ্ঞতা নাই, নইলে কাজ ফুরোলে আমাদের তাড়িয়ে দেওয়া হবে কেন? দৃষ্টিলাভ করিয়া অদৃষ্ট-সুখী যে অন্যায় করিয়াছে ইহাই তাহাদের অভিমত। ইহা তো দুই দিন পরের অভিজ্ঞতা। প্রথম দিনের অভিজ্ঞতা এখনো বর্ণনা করা হয় নাই।

অদৃষ্ট-সুখীর দৃষ্টিলাভে তাহার স্নেহময়ী জননী বলিল—ছি বাছা, এতদিন চোখ বুজে থেকে কি বাপ মায়ের মনে কষ্ট দিতে হয়? তুমি তো আমার ভাল ছেলে!

পিতা আসিয়া বলিল—যাক্ ভালোই হ'ল। এখন তো ওর কোন কষ্ট নেই। নূতন সম্পত্তিটা ওর একার নামে না রেখে ওদের কয়েক ভাইয়ের নামে ক'রে দেবো।

সাধ্বী স্ত্রী সম্মুখে আসিল। হাসিয়া হাত নাড়িয়া বলিল—যা হোক্ এতদিন খুব ঢঙ করলে—এমন নাকি মানুষেও পারে?

অদৃষ্ট-সুখী স্ত্রীর কথা কানে না তুলিয়া তাহার পত্নীর গুম্ফরেখার দিকে তাকাইয়া রহিল। পত্নী চারুবালার চোখ দুটি সুন্দর বলিয়া তাহার মনে একটু অভিমান ছিল। তাহার আশা ছিল সদ্যলব্ধদৃষ্টি স্বামী পত্নীর চোখ দুটি দেখিবে, প্রশংসা করিবে। কিন্তু স্বামীকে চোখের দিকে না তাকাইয়া নাকের নীচে তাকাইতে দেখিয়া ঝঙ্কার দিয়া উঠিল—বলিল—কি দেখা হচ্ছে?

চারুবালা বোধকরি দর্পণ যোগে নিজের দুর্ব্বলতার ক্ষীণ চিহ্নটুকু দেখিয়াছে। স্বামী কোন কথা না বলিয়া একটি দীর্ঘনিশ্বাস চাপিয়া

ফেলিল। সাধ্বী স্ত্রীর কাছে স্বামীর মনের কথা গোপন থাকে না, দীর্ঘনিশ্বাস তো সামান্য। স্ত্রীর কণ্ঠস্বর ঝঙ্কার ছাড়িয়া ক্রেঙ্কার দিয়া উঠিল—বলিল—মেয়ে মানুষ কি এর আগে দেখনি?

স্বামী ইচ্ছা করিলে বলিতে পারিত সত্যই দেখি নাই। কিন্তু তৎপূর্ব্বেই চারুবালা গৃহান্তরিত হইল।

তার পরে বন্ধুরা আসিয়া বলিল—ভায়া খুব চলানটাই চলালে। অন্ধ নাম নিয়ে থেকে পাড়ার মেয়েগুলোকে নির্ব্বিবাদে দেখেছ। আমাদের সামনে মেয়েগুলো আসতে চায় না—অথচ অন্ধ বলে তোমাকে লজ্জা করতো না, খুব মতলব যাহোক করেছিলে, ব্রেভো—এই বলিয়া তাহার পিঠ চাপড়াইয়া দিল।

সে শুনিতে পাইল চাকর দাসীগণ আড়ালে ঠেলাঠেলি করিতেছে—আসল কথা কি জানো। এতদিন বৌমার উপরে অভিমান ক'রে চোখ বুজে ছিল—মানভঙ্গের পরে এবার কলির কেষ্ট চোখ মেলেছে।

রাত্রে পত্নী পাশ ফিরিয়া শুইল—স্বামীকে নাকের নীচের অংশ দেখিবার সুযোগ দিল না। আর বিনিদ্র অদৃষ্ট-সুখী সারাদিনের অভিজ্ঞতা স্মরণ করিয়া ভাবিল শেষ পর্য্যন্ত বিধাতার কথাই কি সত্য হইবে নাকি? অন্ধত্বরূপ একটি দুঃখের পরিবর্ত্তে একাধিক দুঃখের অগ্নিকুণ্ডে পড়িলাম নাকি? সে ভাবিল—দেখাই যাক্—সংসারের রহস্য একদিনে বুঝিয়া ওঠা যায় না। অদৃষ্ট-সুখী দৃষ্ট-সুখী হইবে আশা লইয়া ঘুমাইয়া পড়িল।

৩

পরদিন অদৃষ্ট-সুখীর পুত্র স্কুল হইতে ফিরিয়া আসিয়া পিতাকে শুধাইল—বাবা, প্রতারক শব্দের অর্থ কি?

পিতা বলিল—যে বলে এক, করে আর, যে লোককে ঠকায়। তারপরে শুধাইল, কেন রে?

পুত্র বলিল—পণ্ডিত মশায় আজ তোমাকে প্রতারক বলেছে।

পিতা শুধাইল—কেন?

পুত্র বলিল—প্রতারক শব্দের অর্থ বল্‌তে গিয়ে পণ্ডিত মশাই বল্‌লেন যেমন আর কি নন্তুর বাপ। সে অন্ধ নয়, কিন্তু অন্ধ বলে' লোককে বলে।

পিতা পণ্ডিতের উপর রাগিয়া পুত্রকে এক চড় মারিল—সে পাড়া-জাগানো স্বরে কাঁদিতে কাঁদিতে প্রস্থান করিল। তাহার কাছে সব কথা শুনিয়া মাতা আসিয়া অদৃষ্ট-সুখীর ঘাড়ে পড়িল, বলিল—সকাল বেলাতে নন্তুকে মারলে কেন? বলি তোমার হয়েছে কি? তুমি কি হাতীর পাঁচ পা দেখেছ নাকি?

অদৃষ্ট-সুখী বলিল—তাই বলে কি আমি প্রতারক।

পত্নী বলিতে পারিত সে কি নন্তুর দোষ; কিন্তু সে তর্কে প্রবেশ না করিয়া বলিল—প্রতারক বই কি। একেবারে প্রতারক! ঢং ক'রে চোখ বুজে থেকে খাটিয়ে খাটিয়ে আমার হাড়ে দুর্ব্বো গজিয়ে দিয়েছ, তুমি যদি প্রতারক না হও তো তবে কি ও পাড়ার রাম শর্ম্মা প্রতারক?

অদৃষ্ট-সুখী বলিল—আমার দৃষ্টিলাভ করায় তোমরা খুশী হওনি দেখছি।

পত্নী ঝঙ্কার দিয়া বলিল—হইনি তো! অন্ধ অন্ধের মতো থাকো—তার আবার এত আহ্লাদ কেন?

এই বলিয়া সে দ্রুত প্রস্থান করিল।

অদৃষ্ট-সুখী দেখিল বিধাতার সতর্ক-বাণী অমূলক নয়। তাহার দৃষ্টিলাভে কেহ সুখী হইয়াছে মনে হইল না। তাহার পিতা বলে—চুপ ক'রে বসে থাকলে চলবে কেন। এবারে বিষয় সম্পত্তি একবার দেখা শোনা করো।

মাতা বলে—বাছা এতকাল কেন মিছা কষ্ট দিলে।

পত্নী যাহা বলে—আগেই শুনিয়াছি।

ভাইরা বলে—বাবু এতদিন খুব মজা করেছে, এবারে খাটুক। এমন আরাম পেলে সংসারসুদ্ধ লোক অন্ধ হ'য়ে থাকতে রাজী আছে।

পাড়ার মেয়েরা বলে—ভারি সেয়ানা, অন্ধ সেজে থেকে সব দেখে নিতো।

অদৃষ্ট-সুখী দেখিল যে বন্ধুরা পরিহাসছলে গঞ্জনা দেয়, ভৃত্যরা গঞ্জনাছলে পরিহাস করে, প্রতিবেশীগণের অনুযোগ প্রতিযোগের আর অন্ত নাই। তখন তাহার মনে হইল অন্ধ থাকিতেই সে সুখী ছিল, অন্ধত্ব ফিরিয়া পাওয়াই তখন তাহার কামনা হইল।

আবার সে বাগানের আতাগাছটির তলায় গিয়া বসিয়া তপস্যা শুরু করিল। অল্প সাধনাতেই ভগবান দেখা দিলেন, শুধাইলেন—বৎস, ব্যাপার কি?

অদৃষ্টসুখী বলিল,—স্তর, আপনার কথাই ঠিক, দৃষ্টিলাভ করিয়া কাহাকেও সুখী দেখিলাম না, দৃষ্টি ফিরাইয়া নিন।

ভগবান এবার সুযোগ পাইয়া বলিলেন, দেখিলে তো, মানুষের চেয়ে ভগবানের বুদ্ধি বেশি। তোমরা আজকাল প্রায়ই ইহা অস্বীকার করিয়া থাকো।

অদৃষ্ট-সুখী বলিল—ঘাট হইয়া গিয়াছে, এবার দৃষ্টি লইয়া পুনরায় অন্ধ করিয়া দিতে আজ্ঞা হোক।

ভগবান বলিলেন—তুমি সুখ চাহিয়াছিলে কিন্তু সুখ চোখ কান নাক মুখ প্রভৃতি ইন্দ্রিয় বা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদির উপরে নির্ভর করে না। মরুভূমির বালু হইতেও খেজুর গাছ বা কাঁটা মনসা যেমন রস শুষিয়া

জাইতে পারে তেমনি সংসারের নীরসতম অবস্থাও মানুষকে রস জোগাইতে পারে—যদি মানুষের মন থাকে। দৃষ্টি থাকিলেই যদি সুখী হয়, তবে সংসারে এত দুঃখ কেন? অন্ধ আর কয়জনে? অর্থ থাকিলেই যদি সুখী হয়, তবে ধনীর সন্তান সংসার ত্যাগ করে কিসের দুঃখে? আত্মীয় স্বজন যদি সুখের কারণ হয় তবে কুরু বংশ ও যদু বংশ কাটাকাটি করিয়া মরিল কেন? নিঃসঙ্গতাই যদি দুঃখের হেতু, তবে সন্ন্যাসীগণ অরণ্যে বাস করে কেন? বৎস, দৃষ্টির গুপ্তরহস্য এই যে সুখ বলিয়া কিছু নাই। বিশ্ব সৃষ্টি করিবার সময়ে আমার মনে হইল জোড়ে জোড় গণিয়া হিসাব মিলাইয়া যদি তৈয়ারি করি তবে কিছুদিনের মধ্যেই বিশ্ব ব্যাপার পরিতৃপ্ত হইয়া ঘুমাইয়া পড়িবে। তাই গোদুগ্ধের মধ্যে অম্ল বিন্দুর মত বিশ্বের মধ্যে একবিন্দু অতৃপ্তির রস ফেলিয়া দিলাম—তাহার ফলে দেখো না কেমন আসর জমিয়া উঠিয়াছে। ওই অতৃপ্তির আবেগে লোকে ছুটাছুটি করিয়া মরে—শুধাইলে বলে সুখ খুঁজিতেছি। খুঁজিতে আপত্তি কি—কিন্তু যাহা নাই, তাহা কে পায়।

অদৃষ্ট-সুখী শুধাইল—এমন করিতে গেলে কেন?

ভগবান বলিলেন—একাকী অবস্থায় বড়ই বিরক্তি জন্মিতেছিল—তাই যা হোক্ একটা কিছু তৈয়ারি করিলাম। এই বিশ্ব আমার সুবৃহৎ পরিহাস। সবাই সুখ সুখ, করিয়া হাঁফাইয়া মরিতেছে দেখিয়া আমি আনন্দ পাই।

অদৃষ্ট-সুখী বলিল—তুমি কি নিষ্ঠুর।

ভগবান বলিলেন—আমি নির্মম, কিছুতেই আমার মমত্বজ্ঞান নাই। শিল্পবস্তুর প্রতি শিল্পীর মতো আমার মনোভাব। দ্রৌপদীর দুঃখে কি বেদব্যাস বিচলিত হইয়াছিলেন? সীতার ক্রন্দনে কি বাল্মীকি বিচলিত

হইয়াছিলেন? তবে আমিই বা কেন রামশর্ম্মার পুত্রবিয়োগে, বা যদুবাবুর সম্পত্তিবিনাশে বা অদৃষ্ট-সুখীর অন্ধত্বে দুঃখিত হইতে যাইব?

অদৃষ্ট-সুখী বলিল—প্রভু, অনেকটা বুঝিয়াছি, বাকিটুকু ধীরে সুস্থে বুঝিতে চেষ্টা করিব, আপাততঃ ফিরাইয়া লও।

ভগবান বলিলেন—তথাস্তু! তারপরে অন্তর্হিত হইলেন। অদৃষ্ট-সুখী পুনরায় অন্ধ হইয়া অতিশয় আনন্দে ফিরিয়া আসিল।

পরদিন তাহাকে অন্ধ দেখিয়া পিতা, পুত্র, পত্নী, মাতা, আত্মীয়স্বজন ভৃত্যবর্গ এবং পাড়ার রমণীগণ সকলেই বহুকালের অভ্যস্ত আনন্দের সাধ পাইল।

পত্নী বলিল—যা রয় সয় তাই কর, তোমার কেন বাপু চোখওয়ালার মতো চলা ফেরা।

মাতা বলিল—বাছার আমার কত কষ্ট।

পিতা বলিল—ভাগ্যে দলিলটা পরিবর্ত্তন করিনি।

ভাইরা বলিল—দাদা, আমরা আছি—তোমার ভয় কি?

ভৃত্যরা বলিল—এই তো বড়লোকের মত কাজ।

প্রতিবেশীগণ বলিল—সকাল বিকাল ওঁর বাড়ী গিয়ে চা না খেলে মনে বড় কষ্ট পাবেন।

পাড়ার মেয়েরা বলিল—পাড়ায় দু'একটা অন্ধ থাকা ভাল, মনের সুখে মুখ ভ্যাঙানো যায়।

পুত্র বলিল—পণ্ডিতমশাই বলেছেন আমার বাবা মুখে আর কাজে এক।

অদৃষ্ট-সুখী শয্যায় শুইয়া পড়িয়া বলিল—আঃ বাঁচলাম! সার্থক আমার অদৃষ্ট-সুখী নাম।